হিন্দু আচার ব্যবহার।

প্রথমভাগ—পারিবারিক।

১২৭৯ সালের ১৭ই আশ্বিনে

জাতীয় সভায়

শ্রীমনোমোহন বসু-কর্ত্তৃক

বিবৃত।

কলিকাতা।

সিমুলীয়া ২০১ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট।

মধ্যস্থ-যন্ত্রে

শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৪। ফাল্গুন।

উৎসৃষ্ট উপহার।

নানা গুণালঙ্কৃত স্বদেশহিতৈষী ভক্তি প্রেমাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়

তথা

শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়

সুহৃজ্জন সমীপেষু।

সানুরাগ সসম্মান নিবেদনমেতৎ

"হিন্দু আচার ব্যবহার, ১ম ভাগ—পারিবারিক" প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে চলিল। কিন্তু সাধারণের হস্তে সাহসপূর্ব্বক অর্পণ করা যায়, এমন বস্তু ইহাতে কি আছে? তবে যদি আপনারা সানুগ্রহে ইহাকে স্পর্শ করিয়া কোনো সূত্রে আপনাদের দেশ-ব্যাপ্ত নাম ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে দেন, তবেই ভরসা হইতে পারে।

আমার এ প্রার্থনাও অসঙ্গত হইত, কেবল আপনারা স্বভাবতঃই ঔদার্য্যশীল এবং আমার প্রতি স্নেহবান, এ দুটী কথা আমার জানা আছে; আমি তৎপ্রতিই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম।

তদ্ব্যতীত এই সাহসিকতার আরো গুরুতর উপলক্ষ আছে;—যে জাতীয় সভার বিগত ১৭ই আশ্বিনের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, আপনারা সেই সভার অনুষ্ঠাতা ও পালয়িতা। বিশেষতঃ আপনাদের মধ্যে এক মহাশয় ঐ অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাদ্রীয় অধিবেশনে "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামা সমস্ত ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থানের চমৎকৃতি-জনক ও হিন্দু সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর শ্রেয়ঃ সাধক একটী বক্তৃতা দিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আচার-ভক্তজনের সাহস-

পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন! সে বক্তৃতা অগ্রেই যেন সুচারু কর্ষণ দ্বারা সমাজক্ষেত্রে বীজ বপন করিল; এ বক্তৃতা তদুপরি মৈ টানিয়া দিল, এই পর্য্যন্ত! ও যে টানিয়াছিল, সে কেবল আপনাদের স্নেহ ও সঙ্গ-সাহসে, এই বৈ তো নয়! এখনও সেই স্নেহের বশেই ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে—এখনও আপনাদের নাম-সাহায্য দান করিয়া যাহাতে সহৃদয় পাঠক-সাধারণের প্রশ্রয় লাভে বঞ্চিত না হই, তাহা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা!

কলিকাতা।
ফাল্গুন, ১২৭৯ সাল।

অনুরক্ত প্রীতি-বাধ্য
শ্রী মনোমোহন বসু।

পুঃ নিঃ। সভাতে যাহা শুনিয়াছিলেন, ইহাতে প্রায় তাহাই আছে; কেবল কোনো কোনো স্থলে বাক্যগত যৎসামান্য পরিবর্ত্তন এবং সর্ব্বশেষে অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার প্রকরণে কিঞ্চিৎ নূতন লেখার সংযোগ হইয়াছে, এই মাত্র।

জাতীয় সভার বক্তৃতা।

১৭ই আশ্বিন ১২৭৯ সাল।

"হিন্দু আচার ব্যবহার---পারিবারিক।"

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয়।

বৃহস্পতি-স্মৃত্যুক্ত এই বচনই অদ্য আমাদের প্রবন্ধের শিরোভূষণ হউক। বিশেষে পাশ্চাত্য বিদ্যালোকের প্রভায় আজ্‌কাল্ সকল বিষয়ই পরিদৃশ্যমান হইতেছে। যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি দেশের লোক কণামাত্র চিত্তার্পণ করিতেন না—যে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞানমন্দিরের চতুষ্কোণে অন্ধকার ও জঞ্জালাবৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত, ঐ বিদ্যার প্রখর বিমল জ্যোতিতে তাহাও লোকে দেখিতে পাইতেছে। যাহা না পাইতেছে, যাহা দূরে আছে, যাহা আবৃত আছে, যাহা সহজে প্রকাশ পায় না, তাহাও দেখিবার জন্য লোকে অনিবার্য্য আগ্রহাতিশয্য দেখাইতেছে—কোনো কোনোটীর জন্য নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের জন্য যত না হউক; শিল্পের জন্য যত না হউক; সমর-কুশলতার জন্য যত না হউক; ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বর-তত্ত্বের জন্য, স্বজাতির হীনত্ব মোচন জন্য শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই মহা ব্যস্ত! যাঁহারা হিন্দুনাম ত্যাগ করিয়াছেন, এমন হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও হিন্দু সমাজের উন্নতির আশায় মহা ব্যস্ত আছেন! চৌদিগেই ব্যস্ততা, চৌদিগেই চাঞ্চল্য, চৌদিগেই অভাববোধ, চৌদিগেই অভাব মোচনের যত্ন! সেই চৌদিগের কোনো কোনো দিগে এত উদ্যোগ, এত আড়ম্বর, এত অসহিষ্ণুতা, যে, এক বৎসরে,—এক ঋতুতে,—এক মাসে,—একদিনে—আঃ! এক দণ্ডে—এই মুহূর্ত্তেই হিন্দু সমাজ যদি মহাপ্লাবনের ন্যায় কোনো অলোক-সামান্য ঘটনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া—আমূল উৎক্ষিপ্ত হইয়া—কোনো অভিনব নাম ও অভিনব স্বভাব ধারণ করে, তবেই তাঁহাদিগের অত্যুগ্র আগ্রহের শান্তি হইতে পারে! ফলতঃ পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমাজ পদ্ধতি মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব আলোকের আভায় অনেকের চক্ষে এরূপ ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, যেন তাহার সমস্তই অব্যবহার্য্য, অনার্য্য, অপকারক, সুতরাং ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য! তত্তাবতের আভ্যন্তরিক কোনো গুণ আছে কিনা, তাহা সেই অগ্নি ভেদ করিয়া দেখাইতে পারে না। বহুকালের বাহ্যিক মলাতে আচ্ছন্ন, ভিতরের কথা কে বলিতে পারে? ওতপ্রোতভাবে এবং বিদীর্ণ করিয়া না দেখিলে সার বস্তু অবশ্যই অদৃশ্য থাকা সম্ভব। যাঁহারা মনে করেন, সমুদায়ই দেখিলাম, সমুদায়ই চিনিলাম, ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারা কতদূর দেখিয়া কিরূপ পরীক্ষার জোরে এই কথা বলেন? সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে আভ্যন্তরিক ভাগ পরীক্ষা করিয়া কি বলেন? না ঐ অনলের দীপ্তিতে বাহ্যভাগ যতটুকু দেখা যায়, তাহাই দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া এই সিদ্ধান্ত করেন? বোধ হয় শেষেরটীই হইবে। যদি শেষেরটী হয়, তবেতো সে দেখা দেখাই নয়! কিন্তু আশ্চর্য্য এই,

কেহ যদি বলে, তোমাদের দেখা ঠিক দেখা হয় নাই, তবে তাঁহারা ঐ অনলকে—ঐ পাশ্চাত্য বিদ্যার অগ্নিরাশিকে আরো দীপ্ত করিয়া দেন—তদ্দেশের দৃষ্টান্ত রূপ দাহ্য পদার্থ দিয়া সেই অগ্নিকে আরো প্রবল করেন, করিয়া বলেন, দেখ দেখি ঠিক দেখা হইয়াছে কি না? ফলতঃ সেই বিজাতীয় অগ্নির এমন একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার আলো যত বাড়ে, দ্রষ্টব্য আচার ব্যবহারের গাত্র মলা ততই বেশী দৃষ্ট হয়—তত্তাবতের প্রতি ঘৃণা সেই পরিমাণে আরো বাড়িতে থাকে—আপত্তিকারীদের মুখের উপর আরো অট্টহাস, আরো আস্ফালন প্রকটিত হয়—তখন সেই দৃষ্ট বস্তুগুলি "পদার্থই" নয় এই সিদ্ধান্তটী হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেলের ন্যায় অভ্রান্ত হইয়া উঠে!

কিন্তু সেই তেজোময়ী, অত্যন্ত দীপ্তিময়ী বিদ্যার অত তেজ না বাড়াইয়া স্বল্পমাত্র আলোকের মৃদু কিরণ দ্বারাই যদি আচার ব্যবহার গুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, অভ্যন্তর ভাগ খুলিয়া দেখা যায়, তবে অবশ্যই আর এক প্রকার দেখাইবে—ভাল হ'ক মন্দ হ'ক একবারে সেরূপ ন্যক্কারজনক গাত্রমলার ন্যায় আর দেখাইবে না! সত্য সত্য কিছু আদিম কালের চূড়ান্ত সভ্যজাতির সামাজিক কার্য্য-প্রণালী এতই অসার—এতই বস্তুহীন—এতই ফোঁফরা হইতে পারে না! ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব অনেক তন্ন তন্ন বিবেচনার পর রাজ্যশাসন ও সমাজ সম্বন্ধে গ্রীকজাতির অপেক্ষা হিন্দুদিগের প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন;—

It might be easier to compare them with the Greeks, as painted by Homer, who was nearly contemporary with the compilation of the Code (মনু); and however inferior in spirit and energy, as well as in elegance, to that heroic race, yet, on contrasting their law and forms of administration, the state of the arts of life, and the general

spirit of order and obedience to the laws, the eastern nation seems clearly to have been in the more advanced stage of society. Their internal institutions were less rude; their conduct to their enemies more humane; their general learning was much more considerable; and in the knowledge of the being and nature of God, they were already in possession of a light which was but faintly perceived even by the loftiest intellects in the best days of Athens. Yet the Greeks were polished by free communication with many nations and have recorded the improvements which they early derived from each; while the Hindu civilization grew up alone, and thus acquired an original and peculiar character, that continues to spread an interest over the higher stages of refinement to which its unaided efforts afterwards enabled it to attain. It may, however be doubted whether this early and independent civilization was not a misfortune to Hindus; for seeing themselves superior to all tribes of whom they had knowledge, they learned to despise the institutions of foreigners and to revere their own, until they became incapable of receiving improvement from without, and averse to novelties even amongst themselves.

অতএব সেই দীপ্ত অগ্নিকে আর উদ্দীপ্ত করিও না, কি জানি অতিশয় উত্তাপে অঙ্গ দাহ, কি হয়তো গৃহ দাহ পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। আর যদি উদ্দীপ্তই করিবে, তবে শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি দেশের প্রকৃত অভাব-বাচক পদার্থ দর্শনার্থেই উদ্দীপ্ত কর; তাহাতেই ইউরোপীয় জ্ঞানরূপ গ্যাসের আলোক আবশ্যক; আমাদের সামাজিক আচার বিচার জন্য সে গ্যাসের প্রয়োজন কি? দেশীয় বর্ত্তিকাতেই হইতে পারে—তাহাতে যদি পরিস্কার দেখিতে না পাও, না হয় ইউরোপীয় যুক্তি রূপ বর্ত্তিকা আর ইতিহাস রূপ সামান্য কাচের আলোকাধার গ্রহণ করিলেই মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে!"

এই শেষোক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিবার অভিপ্রায়েই দেশহিতেচ্ছু মহাশয়েরা এই "স্বজাতীয় সভাকে" প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন। সমাজের দোষ গুণ অল্পে অল্পে দর্শন, অল্পে অল্পে গুণের

বর্দ্ধন, অল্পে অল্পে দোষের সংশোধন, অল্পে অল্পে সৌভ্রাত্র-রস স্বজাতি মধ্যে সিঞ্চন, অল্পে অল্পে জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ়ী করণ, ইহাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা করিতে গেলে অগ্রে সমাজের ধর্ম্ম ; পরে তাহার আচার ব্যবহার-তত্ত্বের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সে গুলি কি অবস্থায় ছিল এবং কি দশায় উপস্থিত, তাহা সন্ধান না করিলে—ক্ষত স্থানের মধ্যে শলাকা সন্নিবেশ না করিলে—রোগ কোথায়? কতদূর? আছে কি না? ইহা জানা যাইবে কিসে? ধর্ম্মের বিষয় গত অধিবেশনে সুযোগ্য অনুসন্ধায়ীর দ্বারাই অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তাহাতে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করা গিয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী জ্ঞাতব্য "হিন্দু আচার ব্যবহার" বিষয়টীর তথ্য গ্রহণের আবশ্যকতা কয়েকজন চিন্তাশীল সভ্যের মনে স্বভাবতঃই উদিত হইল। বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি গুরুতর। ইহার আলোচনা এই সভার দ্বারা অবশ্যই হওয়া উচিত। কিন্তু যেরূপ ব্যক্তির দ্বারা হওয়া আবশ্যক, তাহা ঠিক হইতেছে না। সভাস্থলে বক্তামাত্রেই শিষ্টাচারের বশে আপন অযোগ্যতা প্রথমেই যেমন জানাইয়া থাকেন, আমি সেরূপ মৌখিক লৌকিকতায় ইহা বলিতেছি না। এরূপ প্রবন্ধ-লেখককে আর্য্য জাতির শাস্ত্রীয় জ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান লেখক তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ লেখককে পূর্ব্ব কালিক ও আধুনিক সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসের জ্ঞানে সুপক্ক হওয়া চাই। বর্ত্তমান লেখক অন্যের বলিবার পূর্ব্বে আপনিই স্বীকার করিতেছে, সে সেরূপ জ্ঞানের সহিত দূরতর সম্বন্ধই রাখিয়া থাকে! প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ প্রস্তা-বের লেখক বঙ্গীয় সমাজে দুই চারিজন পাওয়া যায় মাত্র। যদি বলেন, তবে কেন এমন দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে? ভার গ্রহণ করি-বার দুইটী কারণ আছে।

তাহার প্রথম, যোগ্যব্যক্তিগণকে উত্তেজিত করা—তাঁহারা

আলস্যে মৌন আছেন, সেই ঔদাস্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া। এই প্রবন্ধ মধ্যে অবশ্যই অনভিজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতা দোষ লক্ষিত হইবে; হইলে তখন, বত্রিশসিংহাসন-বর্ণিত মৌনবতীর মান ভঞ্জনের ন্যায়, তাঁহারা অন্যায় সহ্য করিতে পারিবেন না—অন্যায় সহ্য করা অলসেরও সাধ্য নয়—অন্যায় দেখাইতে কথা কহিবেন; কহিলেই বিষয়টীর সম্যগালোচনা হইয়া উঠিবে!

দ্বিতীয় কারণ, যথা সাধ্য সদ্বিষয়ে লিপ্ত হওয়া সকলেরই উচিত। অধিক সাধ্য, সম্পূর্ণ যোগ্যতা, যথোচিত ক্ষমতা নাই, তাতে কি? তাজমহলের ন্যায় পুরী নির্ম্মাণে অসামর্থ্য বশতঃ কি কেউ আর পুরী নির্ম্মাণ করিতেছে না? ইলোরার গুহা-খোদকের ন্যায় নৈপুণ্য নাই বলিয়া কি আর কেহ পাষাণের গায় বাঁটালীর আঁচড়টী দিতেছে না? না, কালীদাসের অলৌকিক প্রতিভা-প্রাপ্ত না হইলে কেহই আর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত এবং তান্‌সানের ন্যায় অদ্ভুত শক্তি নাই বলিয়া কেহ আর সঙ্গীত ব্যাপারে নিযুক্ত হইতেছে না? ঢাকা আর শান্তি-পুরে চমৎকার বস্ত্র বয়ন হয়, হউক; গ্রাম্য তাঁতি—গ্রাম্য যুগী সে ভয়ে ত্রিশ নম্বরের সূতা বুনন ছাড়িবে কেন? সুদ্ধ এই মহদ্‌দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়াই আমার আজ এই অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। এই দুইটী কারণ স্মরণ না হইলে কদাচই ইহাতে অগ্রসর হইতে পারিতাম না। অতএব সহস্র ত্রুটী হইলেও সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের সদয় হৃদয় প্রশ্রয় দানে কদাচই বিমুখ হইবে না, এই প্রত্যাশায় প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বিষয় ভাগ।

আমি মানস করিয়াছি, এই প্রস্তাব লিখিতে ধর্ম্ম-প্রত্যয় ও ধর্ম্ম-বিচার হইতে যত দূর অন্তর থাকা সম্ভব তাহাই থাকিব। ইহাতে

যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইবে, প্রয়োজনানুসারে তাহার পূর্ব্ব, মধ্য ও বর্ত্তমান অবস্থা অথবা পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অথবা শুদ্ধ বর্ত্তমান অবস্থার পরিদর্শন করিব। বিশদ করিবার জন্য প্রস্তাবকে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। অতএব ইহাকে প্রথমতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। প্রথম পারিবারিক। দ্বিতীয় সামাজিক। বিচার্য্য বিষয় গুলির মধ্যে কোনো কোনোটীর প্রকৃতি এরূপ, যে, তাহা পারিবারিক ও সামাজিক উভ-ধর্ম্মাক্রান্ত। যেমন বিবাহ। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ব্যাপার পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং হিন্দু গৃহস্থের গৃহস্থালীর আদি সূত্র, এইজন্য ইহাকে পারিবারিক ভাগেই সন্নিবেশিত করাগেল। এই সঙ্কেতানুসারে যে বিষয়টী যেদিগে সমধিক সম্বন্ধ রাখে, তাহাকে সেই ভাগেই ফেলা গিয়াছে। ফলতঃ পারিরারিক ও সামাজিক ব্যাপার প্রায় একই বস্তু। আমাদের প্রয়োজন সাধন জন্যই পৃথক করা হইতেছে।

এই দুই ভাগই অদ্য আলোচিত হওনের কল্পনা ছিল। কিন্তু প্রথম ভাগ লিখিতে লিখিতে দেখা গেল, যে এক দিনের অধিবেশনে এই দ্বিভাগ-বিশিষ্ট সমুদয় প্রবন্ধটী পঠিত হইলে, শ্রোতৃবর্গের বৈরক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। প্রথম যখন এই প্রবন্ধ লিখিবার কথা উঠে. তখনই বুঝা গিয়াছিল, যে এক দিনে ইহা হওয়া ভার। কিন্তু লিখিতে লিখিতে যেরূপ হইয়া উঠিল, সেরূপ যে হইবে, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় নাই। নিষ্প্রয়োজনে বেশী বর্ণনা হইয়া যে এরূপ ঘটিল, তাহা নহে। প্রস্তাবের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রসঙ্গই গুরুতর ও বিস্তৃত। তাহার অধিকাংশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু জানা চাই। কোনো কোনোটীর সম্বন্ধে নানা দিগে নানা মত। তত্তাবতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও বহু হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রস্তাবটী নিজের প্রকৃতিতেই দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, লেখকের অনাবশ্যকীয় বাগাড়ম্বর জন্য নহে। বরং ইহার কোনো কোনো প্রত্যঙ্গ বাহুল্য ভয়ে, কোনো

কোনো অঙ্গ যোগ্যতার অভাবে, কোনো কোনো অবয়ব সময়ের স্বল্পতায় যথোচিত রূপে গঠিত না হওয়ায় ক্ষোভ রহিয়া গেল ; ভরসা করি গুণজ্ঞ বুধমণ্ডলী সর্ব্বপ্রকার ক্রটীর জন্যই ক্ষমা করিবেন। এবং "হিন্দু আচার ব্যবহার---পারিবারিক ও সামাজিক" প্রবন্ধের এই যে নামটী শুনিয়াছিলেন, তাহা হইতে "সামাজিক" শব্দটী অদ্য স্মরণ হইতে উঠাইয়া ফেলিবেন। সভার অভিমতি হইলে "সামাজিক" নামা ভাগটী অন্য এক দিনের অধিবেশনে হইতে পারিবেক। অদ্য কেবল প্রবন্ধের প্রথম ভাগ অর্থাৎ "হিন্দু আচার ব্যবহার— পারিবারিক।" ইহাই যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে।

এই প্রথম ভাগকে আবার চারিটী উপভাগে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা ;—

প্রথম। জাত কর্ম্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার।

দ্বিতীয়। বিবাহ।

তৃতীয়। সংশ্লিষ্ট পরিবার।

চতুর্থ। পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়।

জাত কর্ম্মাদি বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার।

জাত' শব্দ ব্যবহার করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওনের পরের কথাই বুঝাইবে না। গর্ভে জাত অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চারাবধি সময়কেও গণ্য করিতে হইবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হিন্দু পরিবারে পূর্ব্বকালে কিরূপ আচরণ আচরিত হইত এবং এক্ষণেই বা কি হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যে হিন্দু-গর্ভে ভীমার্জ্জুন রাম শ্যাম জন্মিয়াছিলেন, এখনও তো সেই হিন্দুগর্ভ আছে, তবে কেন সে আকৃতি প্রকৃতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়

না, তাহা চিন্তা করিলে যত কারণ অনুভূত হয়, তন্মধ্যে পিতা মাতার দৈহিক অবস্থা সামান্য হেতু নহে। বহু পূর্ব্ব কালের হিন্দু মহাত্মারা তাহা সম্যগ্ বুঝিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

অত্যাশিতোঽধৃতি ক্ষুব্ধঃ সব্যথাঙ্গঃ পিপাসিতঃ।
বালোবৃদ্ধোন্যরোগার্ত্তস্ত্যজেদ্রোগীচ মৈথুনং॥

অতিশয় ভোজী, ক্ষুধিত, চঞ্চল, বেদনাযুক্ত, পিপাসু, বালক, বৃদ্ধ এবং উৎকট রোগ-গ্রস্ত স্ত্রীপুরুষ এককালেই সহবাস পরিত্যগ করিবে।

(সুলভ পত্রিকা ৫০ পৃষ্ঠা)

অতি প্রাচীন সংহিতাকার মনু মহাশয় উৎকট রোগ-গ্রস্তকে বিবাহ করিতেই এককালে নিষেধ করিয়াছেন। আধুনিক দর্শন শাস্ত্র-বিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

অতএব জনক জননীর দৈহিক অবস্থার উৎকর্ষ ভিন্ন সুস্থ বলিষ্ঠ সন্তানের আশা বৃথা। তদ্ব্যতীত গর্ভাবস্থায় গর্ভিণী-কর্ত্তৃক কয়েকটী সুনিয়ম পালন, অন্য কর্ত্তৃক গর্ভিণীর সুপালন এবং গর্ভ-দোহদস্বরূপ উপযুক্ত উপভোগাদি কারণগুলিও বড় সামান্য কারণ নহে।

বৈদ্যক ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিষ্কার রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে, যে হেতু প্রতি মাসে নারী পুষ্পিত হওনের চতুর্থ হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত অপত্যোৎপাদনের কাল, তদতিরিক্ত সময়ে পরমাসের তদ্ঘটনা হওন পর্য্যন্ত দম্পাতি-শয্যা পৃথক্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। "এবং তামভিসঙ্গম্য পুনর্মাসান্তজেদসৌ।" (আয়ুর্ব্বেদ) এইরূপ ব্যবস্থার ফল কথা এই, যে, পরমাসে যদি গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ আভাষিত হয়, তবে সেই স্বতন্ত্র শয্যা দীর্ঘব্যাপী হইল—সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষের অতি নৈকট্যভাব আর থাকিবে না। আর যদি পর-মাসে তদ্রূপ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তবে চতুর্থ হইতে ষোড়শ

দিন্ যাবৎ সেই পার্থক্যের কোনো আবশ্যক নাই। জরায়ুশয্যায় জীব-সঞ্চারের পর অহিত নিবারণের শুভ উদ্দেশেই এই সকল সুনিয়ম পূর্ব্বকালে প্রতিপালিত হইত।

ক্রমে এই শাসন শিথিল হইয়া ইতি পূর্ব্বে এতাবন্মাত্র সাবধানতা দৃষ্ট হইত, গর্ভ সঞ্চারের তিন চারি মাস পরে "কাণার মা আর কাণার বাপ" এক ঘরে শয়ন করিতেন না! আজ্ কাল্ আবার সে টুকুও নাই—এখনকার সুশিক্ষিতা জ্ঞান-গর্ব্বিতা তরুণীগণ যতক্ষণ প্রসব বেদনায় কাতরা না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতে ক্ষান্ত হয়েন না! অপরম্বা কিং ভবিষ্যাত! ইহার পরে আরো বা কি হয়? ইহার পরে হয় তো সূতিকাগার প্রবেশ-কালে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না!

পুরাকালে এই শুভকর নিয়মের আনুকূল্যে পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি সৌগন্ধ দ্রব্য, আদিরসাত্মক সঙ্গীত বা কাব্যাদি শ্রবণ. অনুপযুক্ত সখী-সঙ্গ প্রভৃতি বিলাস-রসোদ্দীপক বস্তু ও ভাব-মাত্রই পরিত্যক্ত ছিল। অর্থাৎ অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর স্বামী-সঙ্গ-ইচ্ছা যাহাতে না হয়, তদ্বিধান করা হইত।

অধুনা তন্মধ্যে কেবল পুষ্প ও আতর গোলাপাদি শুঁকিতে ও ব্যবহার করিতে চেতনী গিন্নীরা মানা করিয়া থাকেন! কিন্তু কেন যে তাহা ব্যবহার করিতে নাই, তাহা তাঁহারা জানেন না। এদিগে শাস্ত্রকারেরা যে কারণে উহা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে কারণের পিতা পিতামহ পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে! তবে অকারণে উদ্দীপনের নিষেধ করিলে ফল কি?

তৎকালে এতদ্ব্যতীত আরো বহুবিধ শুভকারিণী সতর্কতার সমাশ্রয় লওয়া হইত। তদ্বিশেষ বলা এরূপ প্রবন্ধের আয়তনে সম্ভব নহে, কেবল কিঞ্চিৎ বুঝাইবার উদ্দেশে সুলভ পত্রিকোদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা;—

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভোজ্যন্তু মধুর প্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রব্যং লঘু॥
সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ।
গুর্ব্বিণী নতুকুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতপর্ণং॥
ব্যবায়ঞ্চ নসেবত নকুর্য্যাদতিতর্পণং।
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা॥
রক্তমোক্ষং বেগরোধং নকুর্য্যাদুৎকটাশনং।
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং নস্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং॥
নিজঘ্রেদপি দুর্গন্ধং নপশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং।
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণিচ॥
নান্নংপর্য্যুসিতং শুষ্কং ভুঞ্জীতক্কথিতঞ্চযৎ।
চৈত্যশ্মশান বৃক্ষাংশ্চভাবাংশ্চাপ্য-যশস্করান্॥
বহির্নিষ্ক্রামণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নোচ্চৈর্ব্রূয়াৎ নতৎকুর্য্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি॥
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনেচ নাত্যর্থং কারয়েদপি।
নমৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাশনং॥ ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ। গর্ভিণী নারী প্রথম দিবসাবধি অতি মনোহর বেশ ভূষা সমাধান পূর্ব্বক পরম প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিবেন। এবং অগ্নি-সন্দীপনী সুমধুর স্নিগ্ধ লঘু দ্রব্য ভোজন করিবেন। ব্যায়াম, লঙ্ঘন, স্বামী-সম্ভোগ এবং অতিশয় স্নিগ্ধাদি সেবাও কদাচ করিবেন না। রাত্রি জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্ত মোক্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং উৎকট আহার পরিত্যাগ করিবেন। বিকৃতাকারা অঙ্গহীনা নারী ও নয়নের অপ্রিয় পদার্থ দর্শন করিবেন না এবং দুর্গন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ লইবেন না। কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ এবং পর্য্যুসিত শুষ্ক দুর্গন্ধ

অন্ন ভোজন করিবেন না। ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমির ভাব আন্দোলন, লোলচর্ম্ম কদাকার বৃদ্ধের মূর্ত্তি ভাবনা, অযশস্কর কর্ম্ম, বহির্গমন, শূন্য গৃহ এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। উচ্চকথা কহিবেন না, এবং যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এরূপ কর্ম্ম ও অতিশয় তৈল মর্দ্দন করিবেন না। অত্যন্ত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিবেন, কিন্তু তাহা অতিশয় উচ্চ করিবেন না ইত্যাদি।

ইত্যাকার কত উপায়, কত নিয়ম, কত শুশ্রূষাই বিধিবদ্ধ ও ব্যবহার-সিদ্ধ ছিল তাহার কত উল্লেখ করিব? তৎপরে অন্যান্য দৈব মাঙ্গলিক আচারের তো কথাই নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের নবাবিষ্কৃত মতের সহিত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের উক্ত ব্যবস্থার অধিকাংশ যে এতদ্রূপ সম-বেদনা-শীল, ইহাই আশ্চর্য্য! যে বুদ্ধির সাগরেরা বলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার কিছুই নয়, উক্ত ব্যবস্থা-লিপি পাঠ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধির পায় নমস্কার করিতে কি ইচ্ছা হয় না? পঞ্চামৃত, কাঁচাসাধ, পাকাসাধ প্রভৃতি প্রথা কি নিন্দাস্পদ? এ সব কি শুভোৎসবের সোপান নয়? এ সব কি মাঙ্গল্য-ব্যঞ্জক চিত্তরঞ্জক অনুষ্ঠান নয়? যদি সন্তানের ভাবী প্রকৃতির বীজ জরায়ু-ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হওয়া সম্ভব হয়; যদি গর্ভস্থ জীব গর্ভধারিণীর তাৎকালিক চিত্তবৃত্তি লইয়াই কর্ম্ম-ভূমিতে অবতরণ করে, একথা সত্য হয়; যদি তজ্জন্য প্রসূতীকে সাবধানে স্বাস্থ্যে, সন্তোষে, সুখে রাখা কর্ত্তব্য হয়, তবে এসব কি নিরবচ্ছিন্ন তাহারি উত্তর-সাধক সদুপায় নয়? এ সব পরিত্যাগ করিবার হেতু কি? যে দেশের বিদ্যা শিখিয়া এদেশের সকলই দূষ্য বোধ হইতেছে, সে দেশে ইহা নাই বলিয়া কি এদেশেও থাকিবে না?

এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জাত ক্রিয়াদি ও সূতিকাগার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য। শাস্ত্রে সূতিকাগৃহের কিরূপ নির্দ্দেশ আছে, তাহা নিশ্চয় করিতে আমি সাবকাশ পাই নাই। কেবল "সূতিকাগৃ-

হাকৃতিঃ। অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্ত বিশালকং।” চারি হস্ত প্রশস্ত, অষ্ট হস্ত আয়ত, মনোহর সূতিকাগৃহ হওয়া আবশ্যক, ইহাই পাই-য়াছি। ইহাই যথেষ্ট। যে প্রকার সূতিকাগৃহ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা অশুচি ও অনাচারের ভয়েই অতি জঘন্য রূপে জঘন্য স্থলেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই হইয়া আসিতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রার্থনীয় বটে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি জাত-কর্ম্ম পূর্ব্বকালের ন্যায় অদ্যাপি কিছু কিছু প্রচলিত আছে। কিন্তু যেরূপ ধাত্রী এক্ষণে নিযুক্তা হয়, তাহা নিতান্ত পূর্ব্বকালের ব্যবস্থার বিপরীত। ধাত্রীর লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা;—

সুবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
স্বাধীনামল্প সন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাং।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশাং শিশৌ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

মধ্যবয়স্কা, সুশীলা, সর্ব্বদা হর্ষযুক্তা, বিশুদ্ধদুগ্ধা, সপুত্রা, অত্যন্ত দয়ান্বিতা, স্বাধীনা, অল্পে সন্তুষ্টা, সৎকুলোদ্ভবা, সজ্জন-দুহিতা, ছল-রহিতা, শিশু প্রতি নিজপুত্রতুল্য দৃষ্টা, ইত্যাদি রূপ বহুগুণ সম্পন্না ধাত্রীই প্রশস্তা।

অধুনাতন কালে ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও আকৃতির ধাত্রীই নিযুক্তা হয়। অনুমান হইতেছে, পূর্ব্বকালে সূতিকাগার-বাসিনী হইলে এক্ষণকার ন্যায় এমন অস্পৃশ্যা হইতে হইত না। অথবা তখন শিক্ষিতা ধাত্রী রমণীর স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, নচেৎ এমন সুরূপ ও সদ্গুণযুক্তা ধাত্রী কোথায় পাওয়া যাইত?

বাহুল্য ভয়ে ধাত্রী সম্বন্ধে আরো যে সব ব্যবস্থা এবং উপন্যাস

আছে, তাহা বলিতে পারিলাম না। সেই ব্যবস্থাতে স্পষ্ট আদিষ্ট হইয়াছে, যে, যাহারা পরিষ্কৃতা নয়, সদাচারিণী নয় এবং ভদ্র মহিলার সহচারিণীর যোগ্যা নয়, এমন সকল স্ত্রীলোককে ধাত্রী করিবে না। এখন অত্যন্ত ইতর লোকের মেয়েরাই ধাত্রী হয়, সুতরাং যত জঘন্য হইতে পারে তাহাই হইয়া থাকে। দেশস্থ লোকের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আশু কর্ত্তব্য।

অপিচ সূতিকালয়ের কতিপয় নূতন প্রথা যাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভদ্রলোকে তাহার অনুমোদন কদাচই করিতে পারেন না। সে সমস্ত লইয়া কাল হরণ করা বিধেয় নহে। অতএব তৎপরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতানুষ্ঠানের আর দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত। পাঁচটে, আটকৌড়ে, নত্বা, ষষ্ঠীপূজাদির ব্যাপার ধর্ত্তব্যই নহে, স্ত্রীসমাজের সংস্কারাধীন মাঙ্গল্য কর্ম্ম দোষাবহ হইতে পারে না। স্ত্রী সমাজে সুশিক্ষিত হইলে আপনা হইতেই তাহার যথোচিত সংস্করণ হইয়া আসিবে। তজ্জন্য যুক্তি, বিচার, বহুল বাগাড়ম্বরের কোনো প্রয়োজন নাই। সে সব আচার থাকিলেই বা কি? আর না থাকিলেই বা কি? কিন্তু গর্ভাবস্থার যে সমস্ত প্রকরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অথবা বাহুল্য ভবে যাহা হয় নাই, তত্তাবতের প্রতি চিত্তার্পণ করা শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই উচিত।

শুভ অন্নপ্রাশন ও নাম করণ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরুদের দেশেও তদ্রূপ একটী প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং নব্য সভ্যগণ তাহাতে আপত্তি না করিতেও পারেন! কেবল পৌত্তলিকতা-মূলক দেবার্চ্চনার জন্য যাহা কিছু গোল। কিন্তু ধর্ম্ম প্রত্যয়ের কথায় স্বতন্ত্র থাকা যখন অভিপ্রায়, তখন তাহার ইতিকর্ত্তব্যতার বিচার ভার অন্যের উপর থাকিল। কেবল এই মাত্র বলিতে পারি, যখন শুদ্ধ হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের বিষয় এই প্রবন্ধে বিচার্য্য, তখন অহিন্দুর কথা এস্থলে আসিতেই পারে না।

তবে কেনই বা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি, বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার গুলিকে সুন্দর প্রথা বলিয়া উল্লেখ না করিব? এই সকল দেশাচার পূর্ব্বকালের বাহুল্য-ব্যাপারের তুলনায় এক্ষণে হীনাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মূলাংশে কতক নিয়ম সংরক্ষিত হয়। বোধ হয় ক্রমে আরো হ্রাস হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব ও বর্ত্তমানের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বহু প্রাচীন মনু সংহিতার তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা দুই চারিটী উদ্ধৃত হইল। যথা;—

২ য় অধ্যায়। প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্য মধু সর্পিষাং ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ। বালক জন্মিবামাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার জাতকর্ম্ম নামে সংস্কার করিবেক ও সেই সময় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবেক। এখন এ সব না করিয়াই একবারে নাড়ীচ্ছেদ করে।

নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্যকারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে ॥ ৩০ ॥

একাদশ বা দ্বাদশ দিবসে নাম করণ করিবেক, তাহাতে না পারিলে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত তিথি, মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রে করিতে হইবেক।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্যতু জুগুপ্সিতং ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবাচক নাম রাখিবেক।

এখন এরূপ কিছুই নাই। সাতকড়ী, দোকড়ী, দোলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ, যে জাতিতে যাহার যদৃচ্ছা সে তাহাই রাখিয়া থাকে! উপাধি বিষয়েও ঐরূপ শর্ম্ম, বর্ম্ম, ভূতি ও দাসাদি মঙ্গল, বল, সম্পত্তি ও দাস্যবাচক উপপদ যুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। এখন ব্রাহ্মণের

উপাধিতে বল ও পেসা বুঝায়, যথা চৌধুরী, হাল্‌দার, ঘটক ইত্যাদি। শূদ্রের উপপদে উচ্চতা, যথা দেব ও মিত্র ইত্যাদি। অপিতু

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
মঙ্গল্যং দীর্ঘ বর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ ॥ ৩৩ ॥

যে নাম সুখে উচ্চারিত হয়, ক্রূরার্থের বাচক না হয়, অনায়াসে যাহার অর্থ বোধ হয়, যাহাতে মনের প্রীতি জন্মে, যাহা মঙ্গল বাচক হয়, যাহার অন্তে দীর্ঘস্বর থাকে, যাহা উচ্চারণে আশীর্ব্বাদ বুঝায়, স্ত্রীলোকের এই প্রকার নাম রাখা কর্ত্তব্য। অধুনা এই নিয়ম প্রায়ই রক্ষিত হইয়া থাকে।

চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥ ৩৪ ॥

জাত শিশুর চতুর্থ মাসে সূর্য্য দর্শন করাইবার জন্য সূতিকা গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ নামা সংস্কার করিতে হয়, পরে ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন নামক সংস্কার কর্ত্তব্য। অথবা আপনাদের কুলে যে সময়ে নিষ্ক্রমণাদি সংস্কারহইয়া থাকে তাহা করিবেক।

তৎপরে প্রথম অথবা তৃতীয় বৎসরাদিতে চূড়া করণের ব্যবস্থা ছিল।

তৎপরে গর্ভ সঞ্চারের গণনায় অষ্টম বৎসরে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওনাবধি সওয়া ছয় বৎসরের পর সওয়া সাত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের বিধি ছিল। ক্ষত্রিয়ের ঐরূপ গর্ভ গণনায় একাদশ বর্ষে ও বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে হওয়া কর্ত্তব্য।

" উপনয়ন সময়ে ব্রহ্মচর্য্যের যে রীতি, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণসার চর্ম্মাদির উত্তরীয়, শণবস্ত্রের অধোবাস প্রভৃতি তিন বর্ণের পৃথক্‌ ব্যবস্থা। কোন্‌ বর্ণ কিরূপ মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, উপবীত কিরূপে ধারণ করিবে? কে কিরূপে কি বলিয়া ভিক্ষা করিবে? কে কিরূপে কোন্‌ অঙ্গুষ্ঠে

কোন্ তীর্থে আচমন করিবে ? কিরূপে ভোজন করিবে ? গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে কিরূপ শৌচাদি ক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে ? অধ্যয়নাদি কিরূপে করাইবেন ? শিষ্য কিরূপ আচরণ করিবে ? কিরূপে সমাবর্ত্তন অর্থাৎ পিতৃকুলে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত গুরু-কুলে অবস্থান করিবে ? কিরূপে হোম-কাষ্ঠ ভিক্ষান্নাদি আহরণ ও অধোশয্যায় শয়নাদি হীনতা স্বীকার করিবে ? ইত্যাদি শত শত বিষয়ের যেরূপ বাহুল্য ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন কি, কোনো কোনো বিষয় একবারেই আর দেখা যায় না—স্নাতক ব্রাহ্মণ এখন আর নাই।

যাহার সমাবর্ত্তন অতি সত্বর সম্পাদিত হয়, তাহাকেই স্নাতক আখ্যা দেওয়া হইত। ঐ আখ্যা পাইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী থাকেন। ইত্যগ্রে যে সকল আচরণের ইঙ্গিত করা গেল, তদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারীকে এই সকল কঠোর করিতে হইত যথা ;—

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥ ১৭৭॥
(মনু। ২য় অ)

অর্থাৎ মধু, মাংস, কর্পূর, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, মাল্য ধারণ, গুড়, স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিবে। স্বাভাবিক মধুর দ্রব্য কারণ বশে অম্ল হইয়া শুক্ত নাম পায়, তাহাও খাইবে না। এবং প্রাণি হিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত-বাদনং॥ ১৭৮॥

অর্থাৎ যাহাকে লোকে আভান করিয়া তৈল মাখা বলে, তাহা করিতে পাইবে না ; নয়নে অঞ্জন দান, চর্ম্ম-পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিতেও পাইবে না ; বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিবে ;

এবং নৃত্য গীত বাদ্যও ত্যাগ করিবে। ইত্যাদি বিস্তর বিধি নিষেধ আছে। সকল শুনিলে, যাঁহারা কখনো সে সব ব্যবস্থা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবাক্ হইতে হয়! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শুনা যাইত, দিল্লীতে গান শিখিতে গেলে ওস্তাদ্জীর যেরূপ উপাসনা করিতে হয়, তাহা অসহ্য! কিন্তু আমাদের বহু পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সব শব-সাধনে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া স্নাতক নাম পাইতেন, তাহার নিকট আধুনিক কালের কোনো কৃচ্ছ্র সাধনকেই কষ্ট সাধন বলা যায় না।

এই কঠোর ব্রত পালনপূর্ব্বক ছত্রিশ বর্ষ ব্যাপিয়া গুরুগৃহে থাকিবার পর স্নাতক ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহণানন্তর গৃহস্থ হইতে পারিতেন!

কৈ? এখন আর কি তাহার অণুমাত্র দৃষ্ট হয়? এখন যাহারা শিক্ষার্থী, তাহাদের তদ্রূপ করা দূরে থাকুক, তদ্বিপরীতে বরং এমনি বোধহয়, যেন শিক্ষা করিয়া শিক্ষককে চরিতার্থ করিলেন! ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া গুরুর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই করিলেন!

এই সকল পূর্ব্বরীতি বর্ণনা করাতে আমার এমন অভিপ্রায় নহে, যে, সেই পূর্ব্ব রীতি পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হউক। পরিবর্ত্তনের ক্রম দেখানোই উদ্দেশ্য। পরিবর্ত্তন ধর্ম্ম জগতের স্বাভাবিক বৃত্তি। সেই অলংঘ্য প্রকৃতিকে লংঘন করে, কাহার সাধ্য? অনেক ইউরোপীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিয়াথাকেন, হিন্দুসমাজ সহস্র সহস্র বৎসরেও অপরিবর্ত্তিতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুকর্ত্তৃক তাহা নহে। যাহা বলা গেল তাহা এবং বক্ষ্যমান অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবে। সমাজের আদ্যাবস্থার ব্যবস্থা পরবর্ত্তী কালে অবশ্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে এখন তো পরিবর্ত্তনের যুগ। কোনো কোনো আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়া যোগে আপনা হইতেই সকল বিষয়ের রূপান্তর সিদ্ধ হইতেছে। যখন এরূপ অবস্থা,

তখন দল বাঁধিয়া পূর্ব্ব সমাজ ছাড়িয়া বলপূর্ব্বক অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাওয়া কেন? আমি যদি কোনো বস্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে দিতে উদ্যত হই, তাহা বল করিয়া আপনার লওয়ার আবশ্যক কি? সে বলের এক মাত্র অভিসন্ধি এই হইতে পারে, যে, লোকে জানুক এ কাজ আমার যত্নে—আমার দ্বারাই হইয়াছে, আপনা হইতে হয় নাই? কিন্তু সেটী বিষম ভ্রান্তি। কোনো গুরুতর বিষয়ের পূর্ব্ব প্রকরণ গুলি পরিপক্ক না হইলে অকালে বলপূর্ব্বক কিছুই হয় না—কিলিয়ে কাঁঠাল কখনই পাকে না!

যাহা হউক এ কথা এক্ষণে থাকুক। ইচ্ছা আছে "সামাজিক" নামক দ্বিতীয় ভাগে তদালোচনা করা যাইবেক। অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংস্কার বিবাহের কথা বক্তব্য। তাহার পূর্ব্বাপর অবস্থাও দর্শন করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহ।

পূর্ব্বকালের অষ্ট প্রকার বিবাহের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তদ্যথা;—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্ঠমোঽধমঃ॥

মনু সংহিতা। ৩য় অ। ২১॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিঃ॥

ঐ॥ ঐ। ২৭

সুবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যা ও বরকে বিভূষিত করিয়া বিদ্যা, সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যাদান করা ব্রাহ্ম।

যজ্ঞেতু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

ঐ। ঐ। ২৮।

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারম্ভকালে যজ্ঞের পুরোহিতকে সালঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদানকে দৈব বিবাহ বলে।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥

ঐ। ঐ। ২৯।

যাগাদি সিদ্ধির জন্য (কন্যা বিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ নহে) বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোমিথুন লইয়া কন্যাদানকে আর্ষ বিবাহ বলে।

সহোভৌচরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যা প্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

ঐ। ঐ। ৩০।

তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া প্রাজাপত্য বিবাহ।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

ঐ। ঐ। ৩১।

কন্যার পিত্রাদি জ্ঞাতিকে বা কন্যাকে শক্ত্যনুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে কন্যার পাণিগ্রহণ আসুর বিবাহ।

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥

ঐ। ঐ। ৩২।

বর ও কন্যা উভয়ের অনুরাগ-সঞ্চার-জনিত বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ ভোগেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে।

হত্বাচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥

ঐ। ঐ। ৩৩।

বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে। কোনো মতে এ বিবাহে পরেও দান করা যাইতে পারে।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥

ঐ। ঐ। ৩৪।

নিদ্রাভিভূতা, মদ্যবিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা রমণীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমনের নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহা পাপজনক, এই জন্য অধম নামে অভিহিত।

স্বয়ম্বরা হওনের প্রথা ক্ষত্রিয় জাতিতেই শুনা যায়। ফলতঃ এই কয়েক প্রকার বিবাহের মধ্যে অধুনাতন কালে ছয় সাতটী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, দুই এক প্রকার মাত্র প্রচলিত আছে। যথা আসুর বিবাহ। শুল্ক দিয়া পানি-পীড়নের নাম আসুর। এবং আংশিকরূপে প্রাজাপত্য বিবাহ এক্ষণে বিদ্যমান দেখা যায়। যদি বলেন পণ না লইয়া শত শত ঘরে যে বিবাহ হইতেছে, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ কি বলা যায় না? আমার মতে সম্পূর্ণ নয়। কেননা যদিও ব্রাহ্ম বিবাহের অন্যান্য লক্ষণের সহিত প্রচলিত দান করা বিবাহের ঐক্য আছে, কিন্তু "অপ্রার্থক বরকে" দান করার লক্ষণটী মিলিতেছে না। অনেক স্থলে অপ্রার্থক বর লইয়া বিবাহ দেওয়া হয় বটে, বিশেষতঃ আজ্ কাল্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী সচ্ছাত্ররূপ সৎপাত্রকে বহু উপাসনায় বহু মুল্য দিয়া এক প্রকার ক্রয় করিয়া তোষামোদের

সহিত আনিয়া কন্যাদান করা হয় বটে, কিন্তু সে ঘটনা সাধারণ নহে। যাহাহউক তথাপি আসুর ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে অন্যান্য প্রকার পরিণয় অতলস্পর্শ কালসাগরে মগ্ন হইয়া গিয়াছে! কেবল মহানাটকের পুনরুদ্ধারের ন্যায় গান্ধর্ব্ব বিবাহটী সেই সিন্ধু-গর্ভহইতে পুনর্ব্বার উত্তোলনের উদ্যোগ এখন হইতেছে!

সুতরাং প্রায় সকল প্রকার বিবাহই যখন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন সে কালের বিভাগ এখন আর খাটেনা। এখন নূতন প্রকারের বিভাগ করিয়া বিচার করিতে হয়। বোধহয় নিম্ন লিখিত রূপে বিভাজিত হইলে অপ্রযুজ্য হইবে না। যথা;—

বহু বিবাহ, তরুণী বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণা বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, চুক্তিবিবাহ, যুক্তি বা মুক্তি বিবাহ এবং বিবাহ!

এই আট প্রকার বিবাহ দুই মতে সিদ্ধ। অল্প ভাগ চির-প্রচলিত হিন্দুমতে, তদপেক্ষাও অল্প ভাগ রেজিষ্টরীমতে, এবং বেশীর ভাগ নব প্রচলিত ব্রাহ্মমতে।

শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহ যেমন ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, এই অষ্ট বিধ উদ্বাহের কোনো কোনোটীর সেইরূপ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হইতেছে।

বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের তাৎপর্য্য বেশী বলিতে হইবে না। অবশিষ্ট তিনটীর অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝানো আবশ্যক।

১ ম, চুক্তি বিবাহ। চুক্তি বিবাহ তাহাকেই বলে, যাহাতে ধর্ম্মের কোনো সংশ্রব নাই। ধর্ম্ম-বিবাহের মতে পতি পরম গুরু, পতিবই অবলার গতি নাই, পতি-ভক্তি ঐহিক পারত্রিকের এক মাত্র মঙ্গলের নিদান, পতি অহিতাচারী ও অপ্রিয় বাদী হইলেও পত্নীকে হিতকারিণী ও প্রিয়বাদিনী হইতে হইবে, অন্যথা ঘোর নরক অবশ্যম্ভাবী। ও পক্ষে

আবার ধর্ম্মের দ্বারে—ঈশ্বরের নিকটে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া যে পত্নীকে পতি চিরজীবনের জন্য গ্রহণ করেন, তিনি যদি তাহাকে যথাসাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, যত্ন ও স্নেহ করিতে; সম্ভবমত সুখিনী ও প্রকৃতরূপে সহধর্ম্মিণী ভাবিতে এবং তাহার ইহপরকালের কল্যাণব্রতে ব্রতী হইতে ক্রটী করেন, তবে তাঁহারও ঘোরপাপ ও তৎফল-রূপ নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী। এরূপ দম্পতীর মতে সর্ব্বপাতা পরম পিতা অথবা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বা আজ্ঞাতে আমরা সংবদ্ধ, আমরণ এবং মরণের পরেও আমাদের ছাড়াছাড়ি নাই। আমাদের পরস্পরের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে। ইত্যাকার ধর্ম্ম-মূলক সংস্কার যে বিবাহে নাই, তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

বাণিজ্য কার্য্যে যে প্রণালীতে ও যে ভাবে দেনা পাওনা ও ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি-নামা অথবা স্বীকৃতি-নামায় লোকে বদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রণয়ের আদান প্রদান, সুখের বিনিময় এবং কর্ত্তব্যের ক্রয় বিক্রয় জন্য স্ত্রীপুরুষে বিবাহ নামা অঙ্গীকার-সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহাকেই "চুক্তি-বিবাহ" বলে। দর্পণে মুখদেখা! তুমি ভাল-বাসিবে আমিও বাসিব। তুমি ভাল বলিবে আমিও বলিব। তুমি ভাল করিবে আমিও করিব। তুমি ভাল রূপে চলিবে আমিও চলিব। তুমি প্রেম ও প্রতিপালন রূপ মূল্য দিবে, আমিও প্রেম ও সহবাস রূপ দ্রব্য বিক্রয় করিব। তুমি সেই মূল্য দিতে যখন না পারিবে, আমি চুক্তি-পত্রের নিয়মমতে খালাস পাইয়া অন্যের সহিত চুক্তি-নামা অথবা যদৃচ্ছা গমন করিব! তাহাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হইবে, কি তাহাতে কোনো কলুষ জন্মিবে এমন বোধ থাকে না। তাহাকেই চুক্তি-বিবাহ বলে।

২ য়, যুক্তি বিবাহ। বারাঙ্গনাদি কুলটার সহিত প্রণয় সংঘটন হইল। বিবাহার্থী পুরুষ মনে মনে যুক্তি করিল "জগতে প্রাপী নয়

কে ? আমি পাপী, এ রমণীও পাপিনী। পূর্ব্বে যে কারণে হউক পা-পাচরণ করিয়াছে, এখন তো আমা বই জানে না। আমিও ইহা ভিন্ন জানি না। তবে কেন ইহার সহিত অসামাজিক সম্বন্ধ রাখি ? ইহাকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য !” যে চিন্তা, সেই কাজ ! তৎক্ষণাৎ এক-খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোটক-যান আনাইয়া বর ক’নে রেজিষ্টরি আফিসে উপস্থিত ! ব্যবস্থাপক সভার কল্যাণ হ’ক্ ! যে আইন বিধি বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতো পতিত পাবন—উপপতি উপপত্নী শব্দটী অভিধান হইতে উঠাইয়া দিবার সূত্রধর ! রেজিষ্টরী হইল তো পরম পবিত্র উদ্বাহ-সংস্কারও হইয়াগেল ! বর, বধূ লইয়া বাটী আইল। পিতা, ভ্রাতা আত্মীয়জন মহা বিপদে পড়িলেন ! হয়তো তাঁদের সেই বউ-মাকে তাঁহারা পূর্ব্বে কোনো অসাধু সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন— হয়তো নিজ বাটীতেই নর্ত্তকী দলের সঙ্গে নাচিতেই দেখিয়া থাকিবেন, আজ্ কি বলিয়া পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করেন ? কিন্তু উপায়ই বা কি ? আইনমতে ছেলে বিবাহ করিয়াছে, রেজিষ্টরী হইয়াছে ! ওদিগে হিন্দু ধর্ম্মমতে পতিত সন্তানেরাও বিষয় পাইতেছে, কি করেন ? বকা ঝকা করিয়া কর্ত্তা রাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বাটীর বাহিরে গেলেন ! ছেলে বউ লইয়া বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেল ! এই বিবাহকে “যুক্তি বিবাহ” অথবা “মুক্তি বিবাহ ও” বলাযায় ! কেন না, যুক্তি বলে পাপের জীবন হইতে অবলার মুক্তি সাধন যে বিবাহে হইল, তাহাকে “মুক্তি বিবাহ” বলাতে কোনো মতেই অযুক্তি হইতে পারে না !

এক্ষণে যে বিবাহকে “বিবাহ” বলাগেল তাহার ব্যাখ্যা বাকী। তাহা আর কিছুই না, আমাদের চির প্রচলিত সাদা সিদে বিবাহ। “বাল্য বিবাহ” বলিয়া যে বিবাহের নাম করণ আছে, এ বিবাহ তাহাও হইতে পারে। বাল্য বিবাহ বলুন, হিন্দু বিবাহ বলুন, আর

মুগ্ধ বিবাহই বলুন এই বিবাহতেই হিন্দু সমাজ চলিয়া আসিতেছে। তরুণী-বিবাহ বলিয়া যে একটী নূতন নাম ইতি পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহাই ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক কুলীনের ঘরে এই তরুণী-বিবাহ মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সাধারণ প্রথা নহে।

অধুনা সেইরূপ বিবাহ প্রচলন জন্য চতুর্দ্দিগে চেষ্টা হইতেছে। বাল্য বিবাহের ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তরুণী-বিবাহের পক্ষ সমর্থনে এক্ষণে শিক্ষিত যুবক মাত্রেই প্রস্তুত। বাল্য বিবাহের যে সব দোষ তাঁহারা বলেন, তাহার বহুলাংশই বহু লোকের মতে যুক্তিমূলক বটে। কিন্তু বালিকার বাল্যকাল কত দিন পর্য্যন্ত? বালিকা বয়সের সীমা কি? তাহা নিরূপণ করিয়া কেহই বলেন না। একজন ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ প্রাকৃত-ইতিবৃত্তলেখক বহু সন্ধানে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন, উষ্ণ-প্রধান দেশে নয় বৎসরের পর একাদশ বর্ষের মধ্যেই সচরাচর স্ত্রীজাতির যৌবনদশা উপস্থিত হয়। সাহেবের সিদ্ধান্ত বলিলে অনেকের ভক্তি হইবে এই জন্য বলিলাম; নচেৎ আমাদের মধ্যে কে না চাক্ষুষ করিতেছেন, কোনো কোনো বালিকা নবম দশম বর্ষেই বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তা বা যৌবন-সোপানে আরূঢ়া হইয়া থাকে? একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকারা সচরাচর পুত্রবতী হইতেছে। ইহার প্রমাণার্থ দূরে যাইতে হইবে না, হয় তো এই সভাস্থলে এমন মহাশয় অনেকেই আছেন, যাঁহারা তদ্রূপ পুত্রবতীর পুত্রের পিতা! মনে মনে হয় তো তাঁহাদের এমন আগ্রহ হইতেছে, যে, এখনি উঠিয়া বুকে হাতদিয়া ডাকিয়া বলেন, যে, "হ্যাঁগো, আমি এই ঘটনার ভুক্তভোগী সাক্ষী!" কিন্তু ইংরাজী শিখিয়া আমাদের কেমন একটা দোষ জন্মিয়াছে, আপন চক্ষে কিছুই দেখিব না — আপন কর্ণে কিছুই শুনিব না — আপন বুদ্ধে কিছুই বিচার করিব না! বিশেষতঃ সামাজিক বিষয়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকূলে যাহা লিখিত হয়, যাহা দৃষ্ট হয়, যাহা বিচারিত হয়, তাহাই লেখা, তাহাই দেখা, তাহাই বিচার, তাহাই

বেদ, তাহাই ব্রহ্ম! সে দেশের মীমাংসা যে সেই দেশের অবস্থানুসারে হইয়া থাকে, সে মীমাংসা যে সকল দেশে, সকল বিষয়ে খাটেনা, তাহা আমরা ঠাহর করিয়া দেখি না! তাহা আমরা যদি মুখের কথাতেও দুই একবার বলি, কিন্তু উন্নতির কাজে উন্মত্ত হইয়া কাজের বেলা ভুলিয়া যাই!

এস্থলে গ্রীস দেশের মহাজ্ঞানী সক্রেটীসের একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান মনে পড়িল। তিনি যে সময় এথেন্স নগরে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে কুতার্কিক দলের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেই কুতার্কিক উপদেষ্টা বর্গের তর্কশক্তি সামান্য ছিল না। তাহারা আশ্চর্য্য তার্কিকতাবলে দিনকে রাত্ রাত্কে দিন, মনুষ্যকে পশু, পশুকে মনুষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিত। সক্রেটীস স্বীয় অসাধারণ সত্য-প্রকাশক ক্ষমতা গুণে তাহাদিগের কুযুক্তি ও মিথ্যা মীমাংসক তর্কপ্রণালীকে স্বীয় আশ্চর্য্য যুক্তি-প্রণালীতে খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য তাহাদের অযশস্কর ব্যবসায়ের হানি হইতে লাগিল। কাজে কাজেই তাঁহার প্রতি তাহারা বিরূপ ও প্রতিশোধের উপায়াবলম্বী হইয়া উঠিল। একদা ঐরূপ একজন কুতার্কিক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য বলিল।

"আচ্ছা সক্রেটীস! তুমি কেমন বিজ্ঞ, বলদেখি পৃথিবীতে উত্তম বস্তু কি?"

সক্রে। "তুমি কি স্বাস্থ্যের জন্য কি উত্তম জিজ্ঞাসা ক'চ্ছো?"

তার্কি। 'না'

সক্রে। "তবে পীড়ার সময় কি উত্তম?"

তার্কি। 'না'

সক্রেটীস এই রূপ যে কয়টী বিষয়ের নামোল্লেখ করিলেন, ঐ কুতার্কিক সে সমুদায়ের উত্তরেই "না" শব্দ ব্যবহার করিল। তখন সক্রেটীস বলিলেন, "তবে তুমি সেই উত্তমের কথা প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা

কোনো বিষয়ের পক্ষেই উত্তম নয়!" কুতার্কিক বলিল, "সেকি? আমি জানিতে চাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদার্থ কি?" সক্রেটীস বলিলেন, "এমন বস্তু নাই!"

উত্তর। কেন?

প্রত্যুত্তরে সক্রেটীস বুঝাইলেন, "নিরবচ্ছিন্ন উত্তম বা নিরবচ্ছিন্ন অধম এমন কিছুই জগতে নাই। সময়, অবস্থা ও স্থল-ভেদে এক বস্তুই কখনো উত্তম কখনো অধম হইয়া থাকে। ক্ষুধার সময় যে অন্ন অমৃত, অক্ষুধায় তাহা বিষ। রোগ বিশেষে যে বিষ প্রাণদাতা হয়, সুস্থাবস্থায় তাহাই প্রাণনাশক হইতেছে। এক ব্যক্তিতে যে দান পরম উপকারী, অন্য ব্যক্তিতে সেই দান অপকারী হয়। এক দেশে যে নিয়ম, যে আচার, যে রীতি অপরিহার্য্য ও শুভকরী, অন্যত্র তাহাই অপ্রযুজ্য ও অশুভকরী, সুতরাং ত্যজ্য। ইত্যাদি।"

তখন তার্কিক কহিল, "আচ্ছা বলদেখি, জগতে অত্যন্ত সুন্দর কি?" সক্রেটীস পূর্ব্ব প্রণালী ক্রমে বুঝাইয়া দিলেন, এমন বস্তুও নাই। একপদার্থ এক সময়ে, এক স্থলে পরম সুন্দর কিন্তু অন্য কালাদিতে অতি কুৎসিত। যে অঙ্গভঙ্গী নৃত্যকালে সুন্দর দেখায়, গমন বা উপবেশনকালে তাহাই অতি কদর্য্য হইবে। মণিমাণিক্য-খচিত বেশ ভূষা যাহার জন্য প্রস্তুত, তাহার অঙ্গে যদি ঠিক না খাটে অর্থাৎ ঢিলা বা কষা হয়, তবে তাহাও কুৎসিত। আর সামান্য বস্ত্রের পরিচ্ছদ যদি বেশকারীর অঙ্গে ঠিক খাটে, তাহাও পরিপাটী হয়। অতএব সর্ব্বস্থলে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব-পাত্রেই যে এক বস্তু উত্তম ও সুন্দর হইবে, তাহা নহে। যে বস্তু যে উদ্দেশে সৃষ্ট, তাহার তাহাতে নিয়োগ হইলেই সুন্দর বল, উত্তম বল, উপকারী বল, সব হইতে পারে। অন্যথা হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমাদের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই অনুপম নীতিসারময় মহদ্বাক্যটী পদে পদে ভুলিয়া যান। তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর দেশ শীত-

প্রধান, তাঁহাদের নিজের দেশ উষ্ণ। তত্রত্য মাটির গুণে আর হাওয়ার গুণে স্ত্রীলোক কুড়ির কোটায় পা না দিলে যোগ্যা হয় না, এখানকার মহিলারা তত দিনে পাঁচ ছেলের মা! সে দেশের বিবাহ-কাল ঐকারণে বিলম্বে ব্যবস্থাপিত। এদেশের বিবাহ-কাল ঐকারণে সত্বরে আগত হয়। কিন্তু তাহা না ভাবিয়া, সে দেশে যে বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, আধুনিক সমাজ-সংস্কারকগণ এদেশে সেই বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত! একজনের একটী খাসা বাড়ী আর এক-জন দেখিয়া স্বীয় কুটীরে আসিয়া তাহার সাধ হইল, আমিও ঐরূপ বাড়ী করিব। কিন্তু দৃষ্ট পুরী যে স্থলে নির্ম্মিত, তাহার আয়তন অযুত হস্ত; দর্শকের ভিটায় দশ হস্ত ভূমি মাত্র আছে। দৃষ্টপুরীর দক্ষিণে নদী; দর্শকের কুটীরের দক্ষিণে (অন্যের, নিজেরও নয়) বাঁশবাগান ও বন। দৃষ্টপুরীর অধিকারী ভূস্বামী ও লক্ষপতি; দর্শকের ভূম্-লক্ষ্মীর মধ্যে ঐ বাস্তুটুকু, আয়ের মধ্যে ৫।৭ টাকা বেতন! এক্ষণে বিবেচ্য এই, সেই দর্শকের সেই সাধ কি শোভা পায়? সে উন্নতির চেষ্টা কি সঙ্গত? সে চিন্তা কি স্বাভাবিক? না এই কথা শুনিতে পাইলে তাহার আত্মীয় জনেরা তাড়াতাড়ি কবিরাজের বাড়ী হইতে বিষ্ণু তৈল আনাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাখাইতে থাকে! আমা-দের সমাজ-হিতৈষী অনেক তরুণের অনেক বিষয়ের সাধও সেই প্রকার! অতএব তাঁহাদের আত্মীয় জনের উচিত হয়, অচিরাৎ প্রতীকারের কোনো উপায় অবলম্বন করা!

উপরে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে এমন বুঝাইতে পারে, যেন সে দেশের ব্যবস্থাপিত বিবাহ-কালকে স্বভাবানুযায়ী ও দোষশূন্য বলা হইতেছে। এবং এদেশের একাদশ দ্বাদশ বর্ষে সন্তান হওয়ার অবস্থাকেও উত্তম বলা যাইতেছে। আমার অভিপ্রায় কিন্তু তাহা নহে। যাঁহারা সে দেশের রীতির স্তুতিবাদক, তাঁহাদিগের প্রবোধের জন্যই বলা হইল, যে, যদিও তাঁহাদের বাক্যপ্রমাণে সে দেশের

বিবাহকাল সে দেশের পক্ষে উপযুক্ত হয়, তথাপি এদেশে তদনুকরণ সঙ্গত হইতে পারে না। এবং যদিও একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষে সন্তান হওয়া ভাল নয়, কিন্তু তা বলিয়া সে দেশের ন্যায় বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। ইহা বুঝাইবার পর সে দেশের প্রচলিত নিয়মে সে দেশেই অনিষ্ট কি ইষ্ট ঘটিতেছে, এক্ষণে তদ্দর্শন কর্ত্তব্য। এইটী দেখা হইলেই, আমাদের দেশের বয়স নির্ণয়ও সহজে হইবে।

আমাদের দেশে যেমন কন্যাপক্ষে বৈবাহিক বয়সের ও সময়ের ঊর্দ্ধসীমা নিরূপিত আছে, ইউরোপে তাহা নাই। অদত্তা কন্যা ঋতুমতী হইলে, পূর্ব্ব পুরুষ নরকগামী হয়, এই শাসন থাকাতে কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর হিন্দুশ্রেণী বিশেষ চেষ্টা করিয়া কন্যার তদবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বেই তাহাকে পাত্রস্থা করেন। ইউরোপে ইহার বিপরীত নিয়ম। ঊর্দ্ধ সীমা নাই, বরং নিম্ন সীমা স্থির আছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সংঘটনের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত নিন্দিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার গান্ধর্ব্ব বিধান অর্থাৎ নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ সঞ্চারিত না হইলে কৌমার অবস্থার প্রায় পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং বহু বহু কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত কুমারী থাকিতে হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃতির প্রয়োজন এবং প্রকৃত যুক্তি অনুসারে যে কালে দাম্পত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিত, অনেক কুমারীর সে কাল অতীত হইয়া যায়—পরামর্শের বিরুদ্ধ বিস্তারেই অতীত হইয়া যায়। তাহার ফলস্বরূপ ভদ্র সমাজে অবক্তব্য গোপনীয় কাণ্ড সকল ঘটিয়া থাকে। তখন উচ্চ ধরণের সভ্যতা, উচ্চ ধরণের শিক্ষা, উচ্চ ধরণের জ্ঞানোপদেশ এবং তাঁহাদের মতে সর্ব্বোচ্চ ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম, কিছুতেই সেই শোচনীয় পাপের স্রোতকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে না! কুৎসিত বিষয়ের বিবরণ করা এবং আক্রমণ ব্যতীত অন্য জাতীয় কুৎসার বিশেষ কাহিনী বলা

কর্ত্তব্য নহে, নচেৎ সভ্যজাতির এই সামাজিক দোষ — এই কৌমার্য্য-পাঁপের এত বড় বড় উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে, যে, বহু খণ্ড গ্রন্থ হইয়া যায়। যতটুকু বলাগেল, তাহাও বলিতাম না। কেবল আমাদের অবোধ ঘরের লোককে বুঝাইবার জন্যই অথবা স্মরণ করিয়া দিবার জন্যই বলিতে বাধিত হইলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশস্থ অনেক লোক ইউরোপের অবাল্য-বিবাহ-জনিত আভ্যন্তরিক ঘোর অনাচারের বৃত্তান্ত জানিয়াও তদ্দেশের বাহ্যিক সভ্যতা ও বাহ্যিক যুক্তির চাক্‌চিক্য শোভা দর্শনে একবারে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গ ঢালিয়া দেন। তাহার অত্যন্ত ঔজ্জ্বল্যে সূর্য্যকাণার ন্যায় অন্ধ হইয়া স্বদেশের ধর্ম্মমূলক যথার্থ পূর্ব্ব সভ্যতাকে আর দেখিতে পান্ না!

উপরে যে বাহ্যিক সভ্যতা ও বাহ্যিক যুক্তি বলাগেল, তাহা বলিবার তাৎপর্য্য আছে। তাহা এখনই প্রকাশ পাইবেক। অধিক বয়সে বিবাহ দিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি এই কয়টী;—

১। অপত্যোৎপাদন ও গর্ভ ধারণের শক্তি পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, কৌমার অবস্থা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

২। যাহাদের চিরজীবন একাত্মভাবে কালযাপন আবশ্যক, তাহারা পরস্পরের মতি গতি না জানিয়া অচ্ছেদ্য-বন্ধনে কিরূপে আবদ্ধ হইতে পারে? কিন্তু তাহা জানা অল্প বয়সে সম্ভব নয়। সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া অনুচিত।

৩। ঘর সংসার কিরূপে নির্ব্বাহ হওয়া উচিত; পতি পত্নীর, মাতা পিতার কি কি কর্ত্তব্য; এরূপ জ্ঞানযোগ হওনের পর বিবাহ হইলে ভাল হয়।

এইরূপ যুক্তি অবাল্য-বিবাহের পক্ষ। কিন্তু আমরা বলি ইহার প্রথমটী ব্যতীত আর কয়টী যুক্তি, যুক্তিই নহে। শারীরিক ধর্ম্ম বিবেচনায় প্রথমটী গ্রাহ্য হইতেছে। সেই দৈহিক বিবেচনাকে অগ্রে রাখিয়া বিবাহের যোগ্য কাল যদি নির্ণয় করা হয়, তবে কোনো

আপত্তিই হইতে পারে না। আর কয়টী যুক্তি যে অগ্রাহ্য বলিলাম, তাহার কারণ এই, যে, যেমন মৌখিক বা বাহ্যিক যুক্তিতে মতি গতি জানা, প্রণয় সঞ্চার হওয়া, হিতাহিত বুঝা ইত্যাদি আবশ্যক বলিয়া অধিক বয়সে বিবাহের বৈধতা সমর্থন করা হয়, তেমন ও পক্ষে যে যে দেশে অবাল্য-প্রথা চলিত আছে, সেই সেই দেশে যে সব মন্দ ঘটনা ঘটিতেছে এবং এদেশে, যেখানে অধিক বয়সে নয়, অল্প বয়সের বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে যে সব ভাল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তৌল করিয়া দেখা কি উচিত নয় ?

আমরা হিন্দু, আমরা বাল্যকালাবধি হিন্দু পরিবারে ও হিন্দু-সমাজে এই শুনিয়া আসিতেছি, হিন্দু কাব্যাদি গ্রন্থে এই পড়িয়া আসিতেছি এবং উচ্চতম হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও এই উপদেশ পাইয়া আসিতেছি, যে, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রত্নের ন্যায় যত্নের ধন আর কিছুই নয়—আর কোনো বস্তুই তদপেক্ষা অধিক রক্ষণীয় ও অধিক প্রার্থনীয় নয় ! আমরা অর্দ্ধ সভ্য দীন, দুঃখী পরাধীন ঘৃণিত হিন্দু, আমাদের পক্ষে ঐ সামান্য ধনটীই পরম ধন—সাত রাজার ধন—অমূল্য মাণিক ! আমাদের সতীর তেজের নিকট যমও আসিতে পারে না—আমাদের সতীর শাপে ত্রিভুবন এক নিমিষে দগ্ধ হইতে পারে ! আমাদের সতীর মাহাত্ম্য এত ! হিন্দুদিগের অসভ্য মনে সতীত্বের নিকটে ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ পদার্থ ! সেই সতীত্ব রক্ষার জন্য বিষয় বিভব গো মহিষ অশ্ব হস্তী জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত—এমন কি বাঙ্গালী যে চাকরীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন, সে চাকরী পর্য্যন্ত—অধিক কি দেহ প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে হিন্দুমাত্রেই প্রস্তুত ! সুতরাং মৌখিক যুক্তিতে যত বাহ্যিক সুবিধা, যত বাহ্যিক উপকার, যত বাহ্যিক গুণ কেন প্রদর্শিত হউক না—সহস্র প্রণয় নাশের শঙ্কা, সহস্র হিতাহিত জ্ঞানের অভাব কেন শিখান হউক না, কিন্তু যাহাতে সতীত্ব ধর্ম্মের বিঘ্ন হওয়া সম্ভব—সম্ভবই বা বলি কেন ?

বিলক্ষণ ব্যাঘাত তো রাশি রাশি ঘটিতেছে—যাহাতে সতীত্বের এত বিঘ্ন নিশ্চিত, সে কাজ অন্য কোনো বিবেচনাতেই কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার্য্য নহে! অধিকন্তু পুথিগত মৌখিক যুক্তি যদি কিঞ্চিৎ কালের জন্য দূরে রাখ এবং সংসারের প্রকৃত ঘটনাবলী যদি একবার ধ্যান করিতে সম্মত হও, তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। সে কাথাটী এই;—

বল দেখি, সত্য ঠাহর করিয়া বল দেখি, এই বাল্য কালের বিবাহ জন্য এই পূর্ব্বরাগ-শূন্য বিবাহ জন্য, এই কোর্ট-সিপ-বর্জ্জিত বিবাহ জন্য এদেশে কয়টা সংসারের স্ত্রীপুরুষে অপ্রণয় ঘটিতেছে? কয় জন রমণী বা কয়জন পুরুষ পতির বা পত্নীর অনুরাগে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্ম-বেদনায় দগ্ধ হইতেছে? কয়জন বা ছাড়াছাড়ি হইয়া পরস্পরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছে?

আবার সেই উচ্চ উচ্চ সভ্যদেশের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী উত্তম রূপে ঠাহরিয়া দেখ দেখি, সেই অধিক বয়সের বিবাহ জন্য, সেই পূর্ব্ব-রাগ ও কোর্টসিপজনিত বিবাহ জন্য অধিক সংখ্যক দম্পতী প্রণয় পদার্থে প্রতারিত হইয়া মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছে কি না? সহস্র সহস্র গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী পরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া স্ব স্ব গৃহের সর্ব্বনাশ করি-তেছে কি না? শত শত পিতা ভ্রাতা, কুমারী কন্যা ও ভগ্নীর কলুষ-পঙ্কে নতশিরা হইতেছে কি না? "ডাইভোর্স কোর্ট" নামক দা-ম্পত্য-বিয়োগ-ধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পত্তি নথীতে প্রতিদিন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কুলকলঙ্ক অঙ্কিত হইয়া রহিতেছে কি না?

মৌখিক আর বাহ্যিক যুক্তিতে কি করিবে? এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমক্ষে এমন সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-লিখিত নব-শিক্ষিত তর্কশাস্ত্রের যুক্তি পরম্পরা কি দাঁড়াইতে পারে? যদি বলেন, হিন্দু-সমাজেও কি তদ্রূপ গৃহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য মনান্তর এবং ব্যভিচারাদি দোষ নাই? স্বীকার করি, আছে। স্বীকার করি

ইহা সর্ব্বদেশে,—সর্ব্ব সমাজেই আছে। কিন্তু তবে ঠাহর করিয়া দেখিতে বলিলাম কেন? তবে তৌল করিয়া দেখিতে বলিলাম কেন? তালিকা নাই যে ঠিক তুলনা করা যাইবে—সে দেশে বরং আছে, এদেশে তো কিছুই নাই যে ঠিক তৌল করা যাইবে। তথাপি মনুষ্যের অনুমান কোথায় যায়? সে দেশের তালিকা তো দৃষ্ট হইয়াথাকে; যদিও সে তালিকা ঠিক নয়—যাহা প্রকাশ পায়, তদ্ব্যতীত আরো কত আছে—তথাপি যাহা পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট। এদেশের বিষয় এদেশের লোকের অজ্ঞাত নয়, সুতরাং একটা স্থূল অনুমান অবশ্যই হইতে পারে। সেই অনুভবশক্তির গুণে অবশ্যই ইতর বিশেষ প্রতীত হইবে। তদ্রূপ অনুভব করিয়াই দেখুন দেখি, বাল্য-বিবাহ আর কোর্টসিপমূলক অবাল্য-বিবাহের ফল কিরূপ দাঁড়ায়? এরূপে তুলনা করিয়া যদি সর্ষপ আর তাল ফল, গোষ্পদ আর সরোবর, পরেশনাথ আর হিমালয়ে যত প্রভেদ, তত প্রভেদ না দেখিতে পান, তবে এইরূপ মত, যাহা আমি ভজনা করিতেছি, তন্মতাবলম্বী-দিগকে উন্মাদ বলিতে যোগ্য হয়েন—তবে আপনারা এদেশে অদ্যই কোর্টসিপের প্রথা—গান্ধর্ব্ব-বিবাহের প্রথা প্রচলিত করিতে সম্পূর্ণ যোগ্য হয়েন!

কিন্তু পরিবর্ত্তনভুক্ নবীন সম্প্রদায়ের প্রতি যেমন বলা হইতেছে, ও পক্ষে অর্থাৎ পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত পক্ষেও দুই এক কথা বলা উচিত। অত্যন্ত অধিক বয়সে অনুরাগ সঞ্চার দ্বারা স্বাধীন ভাবে বিবাহ কর্ত্তব্য নয় বলিয়া যে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার পরিণয় সংস্কারই বিধেয়, তাহা কোনোমতেই স্বীকার করা যায় না। তাহা স্বীকার করিলে বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে কয়েকটী যুক্তির মধ্যে এযুক্তিকে অর্থাৎ দৈহিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্তিকে যে প্রামাণ্য বলিয়াছি, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা কিরূপে হয়? সকল বিচার্য্য বিষয়েরই দুই অন্ত্য এক মধ্য ভাগ আছে। অত্যন্ত অন্ত্য ভাগ প্রায় সকল বিষয়েরই পরিত্যজ্য।

মধ্যভাগ গ্রহণ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার অল্প সম্ভাবনা। এরূপ মীমাংসা অত্যুগ্র স্বভাবীদের নিকট অসম্ভব। এরূপ মীমাংসা তাহাদের নিকট উপহাসাস্পদ হয়। কিন্তু লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের চরিত্র বর্ণনায় লর্ড মেকলে যে স্বর্ণাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাই তাঁহা-দিগের ব্যবহারের প্রকৃত উত্তর বিবেচনায় উদ্ধৃত করিতেছি।

* "He (Lord Halifax) was the chief of those politicians whom the two great parties contemptuously called Trimmers. Instead of quarelling with this nickname, he assumed it as a title of honor and vindicated with great vivacity, the diginity of the appellation. Every thing good, he said, trims between extremes. The Temperate Zone trims between the climate in which men are roasted and the climate in which they are frozen. The English Church trims between the Anabapatist madness and Papist lethargy. The English constitution trims between Turkish despotism and Polish anarchy. Virtue is nothing but a just temper between propensities any one of which, if indulged to excess becomes vice. Nay, the perfection of the Supreme Being himself consists in the exact equillibrium of attributes, none of which could preponderate without disturbing the whole moral and physical order of the world.

ইহার অনুবাদের চেষ্টা করিয়া বৃথা কেন ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব? ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই যে, বাড়া বাড়ি কিছুই ভাল না, মাঝা মাঝি সব ভাল! দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সকল কার্য্য করিতে হয়। এক্ষণে যে কাল, তাহাতে পরিবর্ত্তন কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না। অতএব পূর্ব্বকালের গৌরীদানের ফলের লোভটী অধুনা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ নিতান্ত শিশু-মতি পুত্র কন্যার বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বয়ঃসন্ধি ব্যতীত বিবাহ দিব না, এই সংকল্পটী যেন সকলের মনেই স্থিরতর হয়। ইহা কিছু নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। পূর্ব্বকালের ঋষিবাক্যানুসারে যে সব বিধান ছিল, তাহা কালক্রমে সকলই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল কন্যার অপেক্ষা বরের বয়স তিন গুণ বেশী হওয়া উচিত।

ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯৪ ॥

মনুসংহিতা। ৯ অঃ।

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের বর, বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। চতুর্বিংশতি বর্ষবয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিবে।

ফলকথা কন্যার বয়ক্রম হইতে বরের তিনগুণ বেশী বয়স হইবে। অন্যথা ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এই ব্যবস্থানুসারে বিবাহ হওয়ার প্রথা বহু-কাল রহিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আবার সুপাত্রের অভাবেই হউক বা যোত্রের অভাবেই হউক, ভদ্র ঘরে প্রায় দশম, একাদশ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেও কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত বালিকা কন্যাকে পাত্রস্থ করা এবং অত্যন্ত বালক পুত্রকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করা যে অনুচিত, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক না হইলে বিবাহ দেওয়া অকর্ত্তব্য, এভাবটী এখনও সাধারণ হয় নাই। যাহাতে সেই ভাবটী সকলের হৃদ্বোধ ও তন্নিয়ম অবশ্য-প্রতি-পাল্য হইয়া উঠে, তাহার চেষ্টা শিক্ষিত শিষ্ট সমাজদ্বারা হওয়াই প্রার্থনীয়।

কিন্তু আর না। এক বাল্য-বিবাহ লইয়াই সকল সময় ক্ষেপণ ক-রিলে চলে কই? বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহের প্রতিপক্ষে লোকের চিত্তভূমি অনেক দূর কর্ষিত ও বীজধারণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়াই তাহাতে যুক্তি বীজ বপন ও উত্তেজনাবারি সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই এত বলা গেল। ইহার মধ্যে আবার বহুবিবাহ বিষয়ে লোকে অধিকতর চক্ষুরুন্মীলনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গদেশে ইহার নিবারণ পক্ষে সম্যক্ উদ্যোগ হইতেছে এবং উদ্যোগী মহাশয়েরা কিয়দংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাহার অসীম দোষের কথা স্বার্থ-পরায়ণ জনকতক লোক ব্যতীত দেশের প্রায় আর সকলেরই মনে বিশেষরূপে প্রতীত হইয়াছে। সুতরাং

তদ্বিষয়ে বাহুল্যরূপ বাক্যব্যয়ের প্রয়োজনাভাব। বাল্য-বিবাহের নিগূঢ় অনিষ্টকারিত্ব তত্ত্বটী শিক্ষিতগণ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট তত প্রতিভাত হয় নাই এবং যাঁহাদের সে বোধাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্ব প্রদর্শিতরূপ অতিপ্রমনে অত্যন্ত প্রবৃত্তি দেখিয়াই তদুপলক্ষে সংকল্পাতীত বেশী কথা হইয়া উঠিল।

এক্ষণে দেখা উচিত, অদ্যকার বিভাজিত অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে কয়টী হইল, কয়টী অবশিষ্ট? চুক্তিবিবাহ ও যুক্তিবিবাহ তো পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। বাল্য, তরুণী, গান্ধর্ব্ব ও বহুবিবাহও এক প্রকার সমাধা হইল। এক্ষণে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ এই দুইটীর কথা কিঞ্চিৎ বলিলেই হয়।

বিধবাবিবাহ।

যে বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথী যোদ্ধা এবং প্রতিপক্ষে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বস্থানীয় বুধমণ্ডলী প্রতি-যোদ্ধা, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমাদের সাধ্যও নয়—শুভও নয়! পূর্ব্বকালে ইহা প্রচলিত ছিল কি না? শাস্ত্রে ইহার বৈধতা ব্যবস্থাপিত আছে কি না? তাহা তন্ন তন্ন রূপে বিচারিত হইয়া গিয়াছে। না পড়িয়াছেন না শুনিয়াছেন, এমন লোক অতি অল্প। সুতরাং এ-স্থলে তদুল্লেখ দ্বারা প্রস্তাব বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? শাস্ত্র ছাড়িয়া যদি যুক্তি-মার্গ ধরা যায়, তাহাতেও নূতন কথা বলিবার কি আছে? এতদ্বিষয়ক যুক্তি-মার্গে ভ্রমণকারীর দল বিবিধ। আমরা তন্মধ্যে কোনো দলে মিশিব বা নূতন এক দল বাঁধিব, অদ্যাপি সে অবান্তর ভেদে সমর্থ হই নাই। আপনারাই নিগূঢ় বুঝিতে পারি নাই—যথোচিতরূপে প্রবোধিত হই নাই—অন্যকে কি বুঝাইব? কি উপদেশ দিব?

এমতে এক্ষণে যুক্তিমার্গ ত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। যুক্তিপথ ত্যাগ করিয়া যদি দয়াবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা হইলে নির্দ্দোষী নবোঢ়া বালার কমনীয় কোমল মূর্ত্তি চিত্তফলকে উদিত হইয়া, ঘোর চাঞ্চল্য

উৎপন্ন ও অপার শোক-সিন্ধুনীরে মগ্ন করিয়া ফেলে ; তখন আর কি শাস্ত্র কি যুক্তি কাহারো কথা শুনিতে ইচ্ছা করে না! যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যজন্মের কিছুই জানিল না, কোনো সাধ আহ্লাদের আস্বাদ গ্রহণে সমর্থা হইল না, জীবিতা থাকিয়া জীবিতা কি মৃতা অনুভব করিতে পারিল না, পাঁচ সখীর সহিত সকল বিষয়ে সখ্যতা — সকল বিষয়ে সাম্যতা স্বত্ত্বেও জীবনের সারভোগে সদৃশা হইতে পারিল না — আপনার প্রাণাধিক সহোদরের শুভবিবাহে ও বাটীর কোনো শুভকর্ম্মে হাত দিতে পাইল না — ভ্রাতার আনীত নব বধূকে বরণ করিয়া কোলে লইয়া ঘরে যাইতে — আহা! স্পর্শ করিতেও পাইল না, এ দুঃখে কি হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? সকল থাকিতে কিছুই নাই — দুঃখের জীবন — মর্ম্মান্তিক যাতনা-ভারবাহী জীবন কি কচি বয়সে কেবল একাদশী করিতেই রহিল? যিনি শাস্ত্রের পরম ভক্ত, যিনি পুরাতনের পরম ভক্ত, যিনি প্রথার চিরক্রীত দাস, তিনিও এ যন্ত্রণা দেখিয়া — দেখার মতন দেখিয়া, অন্তরে ধ্যান করিয়া দেখিয়া নেত্রনীর নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন না! এবং তিনিও স্বশ্রেণীস্থ লোককে আমার সহিত যোগদিয়া এই প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, যে, — "হে সামাজিক জ্ঞানবৃদ্ধ শাস্ত্ররক্ষক মহাশয়গণ! এদুঃখ আর দেখা যায় না! এত কাল তো একথা উঠে নাই, কেহ সেই অবলাগণকে বলে নাই, তাহারাও লেখা পড়া শিখে নাই, অন্য পথ যে হইতে পারে তাহা তখন অণুমাত্রও জানিতে পারে নাই, সুতরাং তখন তাহাতে কোনো হানি ছিল না। এখন চতুর্দ্দিকে এই প্রসঙ্গের তরঙ্গ উঠিতেছে, তোমরা বাহিরে বসিয়া কিছুই শুনিতে, কিছুই পড়িতে পাইতেছ না, কিন্তু দেখ গিয়ে, তোমাদের অন্তঃপুরমধ্যে — যেখানে পূর্ব্বে জ্ঞানপবনের গতিরোধ ছিল — এখন সেই অন্তঃপুরে সেই সব তত্ত্ব, সেই সব জ্ঞান, সেই সব সংবাদ পঠিত, শ্রুত, আলোচিত হইতেছে। আর উঁরির মধ্যে কোনো অভাগিনী অন্য ছলে পাঁচ মেয়ের নিকট হইতে

উঠিয়া গিয়া নির্জ্জন গৃহের শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া শ্রাবণের এক পসলা চক্ষের জল ফেলিয়া হৃদয়-বিদারক উত্তাপের হাতে কঠোর প্রাণটাকে সে দিনকার মত বাঁচাইয়া আইল! অতএব দয়ার্দ্র হও, দয়ার্দ্র হও! উত্থান কর! চেষ্টা কর! অন্ততঃ যদি কোনো মাঝামাঝি রূপ উপায় থাকে, দয়া করিয়া না হয় তাহাই করিয়া দেও! পুত্রবতী প্রৌঢ়ার ভাগ্যে যাহা হউক, নবপ্রসূনবৎ নবোঢ়ার মুক্তি জন্য কোনো উপায় কি হয় না? শাস্ত্র, যুক্তি, দয়া তিনের ঐক্য করিয়া কি কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে না? সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই, এই প্রাচীন বাক্য সকল সময়েই খাটে, এই হতভাগিনীদের বেলাই কি ব্যর্থ হইবে?

হায়! মানব-প্রকৃতি কি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। যে কথায় কোনো মীমাংসাই করিব না মনের স্থিরতা ছিল, করুণা নদীর প্রখর স্রোতে সেই মানস দ্রুমকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া তাহার স্থানে ফলহীন প্রার্থনা পাদপকে আনিয়া কিসে কি ঘটাইয়া দিল!

অসবর্ণ-বিবাহ।

যাউক, এক্ষণে অসবর্ণ বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য পূর্ব্বকালের বিধি নিষেধ গুলি অগ্রে দেখা আবশ্যক।

স্নাতক দ্বিজ সমাবর্ত্তানন্তর দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রমী হইবেন। তদ্ধেতু প্রথমেই সবর্ণা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত আছে।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥ ৪।

মনু ৩য় অঃ।

গুরু অনুমতি করিলে পর সমাবর্ত্তানন্তর বিধানানুসারে ব্রতাঙ্গ স্নান সমাপন করিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সুলক্ষণাক্রান্ত সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

এই সবর্ণা বিবাহের বিধি দিয়া সবর্ণার মধ্যেও অনেক স্থলে পাণিগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র অথবা কুষ্ঠাক্রান্ত প্রভৃতি দোষাশ্রিত কুলের কন্যা। পিঙ্গলকেশী, বিরূপাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, চির-রোগিণী, অল্প মাত্রও লোমহীনা বা অধিক লোমবিশিষ্টা, নিষ্ঠুরভাষিণী, পিঙ্গলনয়না কন্যা। নক্ষত্র, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও দাসাদির নামে যে স্ত্রীর নাম। ইত্যাদি দোষাশ্রিতা কন্যার পাণিগ্রহণে নিষেধ আছে। আধুনিক কালে ইহার কতক মান্য কতক অমান্য হইত। আজ কাল অধিকাংশই অগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু ইহার অধিকাংশকে গ্রাহ্য করাই উচিত। যদি হিন্দু আচার ব্যবহারের শারীরিক পরিচ্ছেদটী পরে কখনো লিখিত হয়, তবে সেই সময়ে তাহার হৈতুবাদাদি বিশেষ করিয়া বলিবার মানস থাকিল।

এই রূপে সবর্ণ-বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরে অসবর্ণ-বিবাহকে নিকৃষ্ট কল্পনা পূর্ব্বক বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ১২।

মনু। ৩য় অঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর বচনোক্ত স্ত্রীই প্রশস্ত জানিবে।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে; বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে; এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা চারি জাতীয়া স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণের বহু বহু দোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ উপরে যেমন অনুলোমক্রমে নিম্ন শ্রেণী হইতে স্ত্রী গ্রহণের বিধান আছে, তৎপরে বিশেষ নিয়ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পক্ষে শূদ্রাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়, ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিশেষ বিধি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ফলতঃ পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ যে চলিত ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণে বর্ণিত নানা ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু সেই অসবর্ণ বিবাহ সীমাবদ্ধ ছিল। যে যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিয়া যশস্বী হইবে, এমন নিয়ম ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিলে কোনো কথা হইত না, কেবল প্রথম দুই শ্রেণী যদি সর্ব্ব নীচের শ্রেণীতে বিবাহ করিতেন, তবেই দোষের বিষয় হইত।

এরূপ দোষ সুসভ্যতম আধুনিক ইউরোপেও ধর্ত্তব্য হইয়াথাকে। তাঁহারা গর্ব্ব করেন যে হিন্দুদের ন্যায় জাতিভেদ ও সবর্ণ বিবাহের দোষ তাঁহাদিগের মধ্যে নাই। খৃষ্টানধর্ম্মের প্রসাদে তদ্রূপ অনুদার ও অধর্ম্মমূলক দেশাচারে তাঁহারা মুক্ত আছেন এবং সমস্ত মানবকে এক পিতার সন্তান ভাবিয়া পবিত্র সৌভ্রাত্র-রসে পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিতেছেন! কিন্তু এ সব মৌখিক কথা, বাহ্যিক যুক্তি ও বাহ্যিক সভ্যতা! তাঁহাদের সমাজের আভ্যন্তরিক ভাগ চিরিয়া দেখিলে এই সমস্ত স্বর্গীয় কথার ব্যবহারগত সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইবে। আজ্ কাল্ ইংলণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য, স্বাধীনতা প্রিয়, উদারতার আধার, এবং আমাদের অনুকরণ স্থল। সেই ইংলণ্ডের মধ্যে লর্ড লেডী উপাধিধারী উচ্চশ্রেণীর লোক অপরাপর শ্রেণীকে বিশেষতঃ নির্ধন শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্রব্যবসায়ী প্রভৃতি স্বজাতীয়গণকে যেরূপ হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় আমাদের দেশের চণ্ডালের প্রতি প্রাতঃস্নাত ব্রাহ্মণের ব্যবহারের সদৃশ! ইহারা অন্য শ্রেণীর

বিশেষ ধনী ভিন্ন অন্য কাহাকে লইয়া ভোজন করিতেও চাহেন না—পরিণয়ের কথায় তো খড়্গহস্ত !

যে দেশে বিদ্যার চর্চা অসম্ভবরূপে প্রবল, যে দেশে সভ্যতার ধার এত তীক্ষ্ণ যে ছুঁতে মাছি কাটে, যে দেশের ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ও উপদেশকেরা ধর্ম্ম-মন্দিরে, যজমানের-মন্দিরে, প্রতিনিধি সভা-মন্দিরে, বাক্যে, সংবাদ পত্রে, গ্রন্থে, সে ভ্রাত্র-তত্ত্বের পবিত্র কথা অজস্র গান করিতেছে—আপনাদের জন্ম-ভূমি ছাপাইয়া উঠিয়া সেই উপদেশ-স্রোত ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে—অন্য দেশে তাঁহাদের গর্ব্বিত-বাক্য শুনিলে বোধ হয় যেন তাঁহাদের নিজের দেশ হইতে সর্ব্ব দোষরূপ জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—এমন যে ইংলণ্ড দেশ, সে দেশে যখন উচ্চ শ্রেণীর এক্‌-ব্যবহার, তখন কুসংস্কারাবিষ্ট আর্য্য দেশের স্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা যে এরূপে আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া যাইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! সেই সভ্য ইংলণ্ডে সবর্ণ-বিবাহ (মুখে না হউক) কাজে এত প্রবল, যে, ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞ ও শারীরিক তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী লোকের প্রমাণ-সিদ্ধ উপদেশকে অবহেলা করিয়াও স্বগোত্রা কন্যা, এমন কি আপনার খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত পুত্রী এবং অতি নিকট সম্বন্ধীয়া পিতৃস্বসা মাতৃস্বসা পুত্রীকেও তাঁহারা বিবাহ করিয়া থাকেন ! ফলতঃ কেবল সহোদরা, বিমাতা ও বৈমাত্র ভগ্নীকে এবং মহাগুরু শয্যাগুরুর ভগ্নীকে মাত্র বাছিয়া থাকেন ! নচেৎ তাঁহাদের অগ্রহীতব্যা রমণী আর কেহই নাই !

এ বিষয়ে বরং হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দুপ্রথা তাঁহাদের আদর্শস্থল হইতে পারে। মনু লিখিয়াছেন—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দ্বারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥

৩য় অঃ। ৫।

যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাতা না হয় ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ পিতৃস্বস্রাদি সন্ততি-সম্ভূতা না হয় এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্যা। এই নিয়ম হিন্দু-সমাজে আবহমান সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা মিলের ঘর না পাওয়াতেই এই শুভকরী ব্যবস্থার যাহা কিছু বিপরীত কাজ করেন—ঠাকুরেরা নাই বা করেন কি? মাতৃস্বসা পর্য্যন্তও হইয়া যাইতেছে!—যাহা কিছু দোষাবহ তাহা তাঁহাদিগেরই তেজস্বী ঘরে এবং আজ্ কাল্ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে কোনো কোনো স্থলে অন্যান্য বর্ণ মধ্যেও তন্নিয়মের সামান্যরূপ অঙ্গভঙ্গ হয়, এই মাত্র। নচেৎ এই সুন্দর প্রথাটী হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ অদ্যাপি মান্য গণ্য হইয়া আসিতেছে। একালে অসবর্ণ বিবাহ এককালে উঠিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে এই সুধারাটী যে উঠিয়া যায় নাই, ইহাকেও পরম ভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবেক।

সবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। পূর্ব্বকালে অসবর্ণ উদ্বাহ যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, সবর্ণ বিবাহ তেমন সঙ্কীর্ণ আয়তনের ছিল না। অর্থাৎ অলক্ষণা কন্যা ও কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত প্রভৃতি দোষাশ্রিত দশবিধ কুল না হইলেই হইল। এই সকল দোষ এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতেও মহদ্দোষরূপে গণ্য ও বিবাহের সম্বন্ধে তদ্দোষাশ্রিত কুলের পুত্র কন্যা সর্ব্ব মতেই সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। তদ্রূপ কুলজাতা কন্যা ব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণের কন্যাকে সকল ব্রাহ্মণবর, সকল ক্ষত্রিয় কন্যাকে সকল ক্ষত্রিয়বর এবং অন্য বর্ণের সকল কন্যাকেই তজ্জাতীয় বর বিবাহ করিতে পারিত! এই মঙ্গলগর্ভ সুন্দর প্রথাটী এক্ষণে নিতান্ত সঙ্কোচিত হইয়া উঠিয়াছে। "রাঢ়ীয় শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী, বারেন্দ্র শ্রেণী প্রভৃতি বহুবিধ ব্রাহ্মণ শ্রেণী, এবং দক্ষিণাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বঙ্গজ, কটকী, মুদী কায়েত

প্রভৃতি বহুবিধ কায়স্থ শ্রেণী হইয়াছে। তদুপরি শাস্ত্রাসিদ্ধ বল্লালী কৌলিন্য থাক্ হইয়া আরো সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে! পূর্ব্বে যাহারা এক বর্ণ ও এক শ্রেণীরূপে আবদ্ধ ছিল, এখন তাহারা নানা বর্ণের নানা শ্রেণীতে খণ্ড বিখণ্ড ভাবে বিভক্ত এবং ঘোরতর জাত্যাভিমানে মত্ত হইয়া পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়াছে। এই বর্ণান্তর্গত শ্রেণী বিভাগ কদাচ ঋষি-কৃত নহে। ইহা শাস্ত্রে নাই, সুতরাং হিন্দুস্থানের কুত্রাপিও নাই। বঙ্গীয় সমাজেই আধুনিক কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বারেন্দ্র কন্যা, রাঢ়ীয় বর; বৈদিক পুত্র রাঢ়ীয় কন্যা; এরূপ বিবাহ হইলে যে কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ হইবে, এমত তো বোধ হয় না। সকলেই এক ব্রাহ্মণ বংশ হইতে সম্ভূত, এমন কোনো কার্য্য কোনো শ্রেণী করেন নাই যাহাতে সেই শ্রেণী পতিত হইয়াছেন! তবে এই ভেদ ঘটিবার প্রধান কারণ বাসস্থান। তখন দেশের এক ভাগ হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের তত সুবিধা ছিল না—রাজপথ বা শান্তিকার্য্যের তত সুশৃঙ্খলা ছিল না, এই জন্যই পরস্পরের ব্যবহার রহিত হওয়াই প্রতীতি হইতে পারে। নতুবা শাস্ত্রে যে এরূপ বিবাহের নিষেধ আছে, তাহা তো শুনিতে পাওয়া যায় না। স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়া যে আমি বলিতেছি, তাহা নহে। এ কেবল অনুমানে বলা। সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার মহিমান্বিত সভাপতি মহাশয় অদ্য আমাদেরও সভাপতি। এ ঘটনা উত্তমই হইয়াছে। তিনি যদি এই অবশ্য-বিচারণীয় প্রস্তাবটী উক্ত সভায় বিচার করেন এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের বুধমণ্ডলীকে উক্ত সভায় ইহার ব্যবস্থা পাঠাইতে অনুরোধ করেন, তবে একটী মহান্ সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হয়। অসবর্ণ বিবাহকে যদি কেহ সহস্রবার এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি সাধারণ হিন্দুসমাজে তাহা এক্ষণে প্রচলিত হওনের কোনো প্রত্যাশা দেখা যায় না।

কিন্তু সবর্ণ-বিবাহ সর্ব্ব শ্রেণীতেই শাস্ত্রসিদ্ধ, বর্ণান্তর্গত শ্রেণী-বিভাগ জন্য বিবাহ আটক থাকে না, এমন কথা যদি প্রমাণীকৃত হয়, এবং উপরে যে সকল যোগ্য পাত্রের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহারা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রথা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেন, তবে তাহা সমাজের গ্রাহ্য হইয়া আশু ফলোৎপাদক হইতে পারে। তদ্দ্বারা এক এক বর্ণের নানা শ্রেণীর ঐক্য বিধান এবং সবর্ণ বিবাহ পদ্ধতিতে অধুনা যে নৈকট্য ও সঙ্কীর্ণতা দোষ জন্মিয়াছে, তাহার পরিহার হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়! অতএব প্রার্থনা করি, এমন বিষয়ে আর ঔদাস্য করা না হয়—অদ্য রজনী প্রভাতে কল্যই যেন চতুর্দ্দিগে এ প্রস্তাবের আলোচনা শুনা যায়, সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা এমন বিধান করুন!

পুনর্ব্বিবাহ।

যে অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলা গেল, তদ্ব্যতীত একটী উপ-বিবাহ বা অতি বিবাহও আছে। তাহার বহু নাম। তাহাকে দ্বিতীয় সংস্কার, দ্বিতীয় বিবাহ, পুনঃসংস্কার, পুনর্ব্বিবাহ, পুষ্পোৎসব, দ্বিতীয় উৎসব এবং মেয়েলি কথায় সূর্য্য অর্ঘও বলিয়া থাকে। এই জঘন্য সংস্কার কবে যে হিন্দুসমাজে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার ন্যায় নির্লজ্জ ও ঘৃণাকর উৎসব বঙ্গীয় সমাজে দ্বিতীয় যে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

দেশে জ্ঞানচর্চ্চার যত আধিক্য হইতেছে, তৎফল স্বরূপ অশ্লীল কথোপকথন, অশ্লীল লেখা, অশ্লীল চিত্র, অশ্লীল সঙ্গীতাদি যত উঠিয়া যাইতেছে, ঐ ঘৃণিত কাণ্ড ততই কোথায় হ্রাসতাকে পাইবে, না ততই তাহার দিন দিন অঙ্গরাগ হইতেছে। রাজধানীতে বিদ্যার প্রাচুর্ভাব অধিক, রাজধানীর শিক্ষিত যুবকেরা সভ্যতা সভ্যতা করিয়া পাগল, কিন্তু সেই রাজধানীতেই যে ইহার জাঁক জমক বেশী হইতেছে, ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি?

আমি দেখিয়াছি, এক প্রতিবাসীর বাটীতে পূর্ব্বে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বিস্তর হইত। যম দণ্ডে তাহা বন্ধ হইয়াযায়। কয়েকটী আশার ধন, বালক ও একটী অক্তী কর্ত্তামাত্র অবশিষ্ট। কালে ঐ বালকেরা ইংরাজিতে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন-শীল যুবপুরুষ হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রিয়া কর্ম্ম আর দেখা দিল না। সে বাটীতে কোনো পর্ব্বাহে, কোনো উৎসবে, কোনো কিছুতে, ইচ্ছাভোজেও আর লোকের পাত পড়ে নাই। এমন সময় এক অংশীর একটী মাত্র বংশধরের দ্বিতীয় সংস্কার উপস্থিত। ঘটার সীমা নাই, আয়োজনেরও অন্ত নাই! কলিকাতার বিস্তর বড় বড় ঘরে তাঁহাদের কুটুম্বিতা। উড়িষ্যাদেশীয়ের নর-যান শত শত নিযুক্ত হইল। নিমন্ত্রিতা কুটুম্বিনী গণ আধিষ্ঠিতা হইলেন। তাঁহাদের দাসীর কল্লোলে পাড়ায় সমুদ্র কল্লোল উত্থিত হইল। পূজার বাটীর প্রাঙ্গণে বৃহতী সভা হইল—বাইনাচের মজ্‌লিস—খেমটানাচের মজ্‌লিস—পাঁচালির মজ্‌লিস। তৎপরে যে ভূরি ভোজ হইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না!

দেখুন, যাহাদের অন্য কর্ম্মে এক কপর্দ্দকও ব্যয় নাই, যাহারা সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত, যাহারা বাঙ্গালীর প্রার্থনীয় ভাল ভাল কর্ম্ম করে, যাহারা অন্য সকল বিষয়ে সভ্যাগ্রগণ্য, তাহাদিগের ভবনেই এই, অন্য পরে কা কথা!

পল্লীগ্রামে সচরাচর এত ব্যয়-সাধ্য ঘোর ঘটা না হইলেও যাহা হয়, তাহা ভদ্রলোকের দেখা থাক্, শুনিলেও কর্ণে হাত দিতে হয়! যে সকল ভদ্র পুরন্ধ্রীগণ স্বভাবতঃ ও দেশাচারসম্মত কোনো বাচালতা ও কিছুমাত্র লজ্জাহীনতা দোষে দোষী নয়, তাহারাও সে দিন ইতর ঘরের ইতর প্রকৃতির স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে, তাহাদের উত্তেজনায়, তাহাদের দৃষ্টান্তে এমন হইয়া উঠে, যে, পরক্ষণে তাঁহারা আপনারাই তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়!

অতএব যাহাতে দেশ হইতে এই ঘোর কদাচার মূল সহিত উৎপাটিত হইয়া যায়, এমত উপায় অবলম্বন করা দেশ হিতৈষী মাত্রেরই উচিত। এই সভা এই দোষ নিবারণে যত্নশীল হইলে দেশের একটী প্রকৃত দুরিত দূরীকরণ করা হয়। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভাও এ পক্ষে পরম সহায়। যদিও সে সভা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়েই সমধিক লিপ্ত, কিন্তু অনেক দুর্নীতি নিরাকরণের চেষ্টাও তদ্দ্বারা হইতেছে। সে সব উচ্চতর বিষয়। উচ্চতর বিষয়ে যে সভা উন্নতি সাধনে সমর্থ, তাহার কাছে ইহা তো অতি সহজ কাজ। বিশেষ এই জাতীয় সভা আর সেই ধর্ম্মরক্ষণী সভা, যদ্যপি কোনো কোনো বিষয়ে, যাহাতে পরস্পরের মত ভেদ নাই, এমন সকল বিষয়ে যদি যোগ দেন, তবে মণিকাঞ্চনবৎ প্রার্থনীয় যোগই হইয়া উঠে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংশ্লিষ্ট পরিবার।

আর্য্য নাম যত প্রাচীন, বোধহয় আর্য্য জাতির সংশ্লিষ্ট-পরিবার প্রণালীও তত প্রাচীন। মনুষ্য সমাজের আদ্যাবস্থায় ইহার আবশ্যকীয়তা যত, উন্নত ও সভ্য কালে তত প্রয়োজন থাকে না। যখন বলবানেরই প্রভুত্ব, দুর্ব্বলের দাসত্ব, তখন প্রবলের দৌরাত্ম্য হইতে আত্ম-রক্ষার্থ আত্মীয় লোক সকলের একত্র থাকা অপরিহার্য্য রীতি হওয়া স্বাভাবিক। সুদ্ধ তাহা নয়, জ্ঞানের খর্ব্বতাকালে স্বাধীনতার ভাব ও আস্বাদ মনুষ্য হৃদয়ে অধিক প্রবল হয় না। কাজে কাজেই পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বশে থাকিতে—আজ্ঞাবহ হইতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় এবং তর্কশক্তির কর্ষণাভাবে "আমি বড় বুঝি, উনিও মানুষ, আমিও মানুষ, আমিই বা কুক্কুরবৎ উঁহার পদলেহন কেন করিব?" ইত্যাকার ভাব হৃদয়ে তখন স্থান পায় না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধ ক্লিষ্ট হইতে পারে না।

কিন্তু হিন্দুদিগের এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের পরেও—যখন তাহাদিগের সভ্যতা, জ্ঞান, তর্কশক্তি অত্যন্ত প্রবল, তখনও এই ভাবের রূপান্তর হয় নাই। যখন মধ্যম পাণ্ডব ভীমের এক একবারের গদাঘাতে রথ, রথী, হয়, হস্তী, পদাতিক চূর্ণায়মান হইত, যখন তৃতীয় পাণ্ডব গাণ্ডীব-ধন্বার ধনুর্নির্ঘোষে ত্রিভুবন কম্পিত হইত, তখনও তাঁহাদের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি "কেনই বা আমরা উঁহার অধীনে থাকিব? আমাদের ভুজ-শাসিত সসাগরা ধরামণ্ডল কেনই বা উনি বসিয়া বসিয়া ভোগ করিবেন?" এরূপ ভাবের কণামাত্র একদিনের জন্যও উদয় হয় নাই! ইহাতেই অনুভব হইতেছে, হিন্দু জাতির স্বাভাবিক দয়া ও আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি অপেক্ষাকৃত সমধিক তেজস্বিনী।

যাহাদের কবিরা নাটকাদি কাব্যে একটীমাত্রও শোক-শেষ আখ্যায়িকা সন্নিবেশ করে নাই, যাহাদের পশু-পক্ষীর প্রাণহিংসাকেও মহাপাপ বোধ, যাহাদের নরহত্যা কি গোহত্যাও গুরুতরপাপ, তাহাদের দয়ার কথা ব্যাখ্যা করিতে হইবে কেন? সেই দয়া যাহাদের শরীরে থাকে, তাহাদের সামান্য আসঙ্গ লিপ্সা বৃত্তি যে প্রবলা হইবে, আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যে কারণেই হউক, হিন্দুরা যে চিরকাল সংশ্লিষ্ট ভাবাপন্ন তাহাতে তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই।

তৎপ্রতিপক্ষে বা সপক্ষে এতকাল কোনো কথাই উঠে নাই—ভাই ভাইতে মিলিয়া থাকিবে, তাহাতে আবার প্রশংসা কি? তাহাতে আবার দোষের আভাবই বা কি? যাহারা ঐক্য বাক্যে থাকিতে না পারিত, তাহাদের নিন্দা হইত, এখনও হয়। এ প্রস্তাব যে একটী বিচার্য্য বিষয়, ইহার যে আবার প্রতিবাদ পক্ষ আছে, একথা কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের পিতা পিতামহ মহাশয়েরা শুনিতে পাইলে হাসিয়া খুন হইতেন! কালধর্ম্মে হাসির কথাতেও কাঁদিতে হয়! আমরা সেই কাল-শাসনে পতিত হইয়া এই প্রথার দোষগুণ বিচার করিতে আজ বাধিত হইতেছি।

দোষগুণ বিচারের পূর্ব্বে দেখা চাই, হিন্দু সংশ্লিষ্ট পরিবার কি রূপ? বাটীতে সমস্ত পরিবারের মধ্যে একজন কর্ত্তা! সম্পর্কে এবং বয়সে যিনি বড়, তিনিই প্রায় কর্ত্তা হইয়া থাকেন। কখনো কখনো বেশী কৃতী, বেশী বুদ্ধিমান, বেশী কার্য্য-কুশল বলিয়া কনিষ্ঠও কর্ত্তা হয়েন। তাহাতে জ্যেষ্ঠকে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইতে প্রায় দেখা যায় না। সন্তুষ্ট না হইবার বিশেষ কারণ আছে। তিনি জানেন আমাপেক্ষা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্র বা পুত্র উত্তমরূপে পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার নির্ব্বাহে পটু, তাহার হস্তে ভারার্পণ করিলে ভালই হইবে। বিশেষতঃ ঐ কনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব করেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধি হইয়া, জ্যেষ্ঠের নাম রাখিয়া এবং জ্যেষ্ঠের নামে নিমন্ত্রণাদি সামাজিক এবং সংকল্পাদি ধর্ম্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য সকলই জ্যেষ্ঠের নাম লইয়া করিতে হয়! কনিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব করেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের নাম কর্ত্তা। তিনি কাজে না হইলে নামে কর্ত্তা বটেন। তাঁহার পুত্রের উপার্জ্জনে বাটীতে যদি ক্রিয়া কর্ম্ম চলে, তবে তো তিনি প্রকৃতই কর্ত্তা! একান্নভুক্ত ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রের উপার্জ্জনে অথবা পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ে হইলেও তিনি কর্ত্তা। পৃথকান্ন ভ্রাতাদির সংসারে সামাজিক বিষয়ে তিনি কর্ত্তা। ঐ রূপ স্বসম্পর্কীয় কেহ স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিলেও তিনি কর্ত্তা। কর্ত্তার অনভিমতে কোনো কর্ম্মই হইতে পারে না। কনিষ্ঠাদি বড় বুঝদার, বড় কর্ম্মক্ষম, বড় উপার্জ্জন শীল, বড় কীর্ত্তিকুশল হইলেও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কর্ত্তার অনুমতি ভিন্ন কিছুই করিতে সমর্থ হয়েন না। তাহাতে কর্ত্তার যদি ভ্রম হয়, যতক্ষণ না তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারেন, ততক্ষণ সাধ্য কি সে কর্ম্ম করেন? মনে করুন একটী সম্বন্ধ উপস্থিত, মনে করুন দলাদলির ঘোঁট উপস্থিত, মনে করুন বাটীর কোনো ছেলেকে বিদেশে কোনো কর্ম্মে পাঠাইতে হইবেক, তাহাতে কর্ত্তা যতক্ষণ মত না দিবেন ততক্ষণ সেকাজ কি হইতে পারে? বাটীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই

কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে চলিতে হয়। তাহারাও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং তৃপ্তিপূর্ব্বক ঘাড় নত করিয়া থাকে! ও পক্ষে আবার কর্ত্তাও বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শাসন-দণ্ড চালনা করেন, অধিকাংশ বিষয়ে পরিবার গাঁচটীর মত ও ইচ্ছা জানিয়া আপন মতকে গঠন করেন। যে কাজে পরিবার মধ্যে সকলের অনিচ্ছা, তাহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা হইলেও অনেক সময় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন না হইলে কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কেন? এমন না হইলে এমন সুন্দর সামঞ্জস্য কি এত কাল হিন্দু-পরিবারে অটুট থাকিতে পারিত? ফলতঃ এরূপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাব, এরূপ গুরু লঘু জ্ঞান, এরূপে বর্ষীয়ানের মান রক্ষা ও কনিয়ানের হিতাকাঙ্ক্ষা ভূমণ্ডলে আর কোনো রাজ্যে — আর কোনো সমাজে — আর কোনো জাতীয় পরিবারের মধ্যে কি পাওয়া যায়? হিন্দু-পরিবার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহাতে নিয়ন্তা ও শাসনকর্ত্তার সমুদায় ভাবই মূর্ত্তিমান! হিন্দু-পরিবারের সু-কর্ত্তৃত্ব যে করিতে পারে, একটী রাজ্যও সে চালাইতে পারে! সুসভ্য জাতিরা এই সংশ্লিষ্ট পরিবার-প্রণালীকে (*Patriarchal system.*) জনকত্ব-শাসন-প্রণালী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সমাজের আদ্যাবস্থায় স্বল্প সভ্যতার সময় এই রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল। এখন সমাজের অবস্থা তদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইয়াছে, এখন স্বাধীনতার কাল, এখন কি আর তাহা শোভা পায়? আমরাও দেখিতেছি তাঁ-হাদের সমাজ ও গৃহ-সংসারের যেরূপ শৃঙ্খলা, তাহাতে ইহার উপ-যোগিতা কিছুতেই হইতে পারে না! শ্রুত আছে, (*Extremes meet together.*) আমাদের চলিত কথায় বলে "রাজা আর ফকির" "বুড়ো আর ছেলে সমান!" এ কথার তাৎপর্য্য চমৎকার! অত্যন্ত জ্ঞানাপন্ন সভ্য মানব আর নিতান্ত জ্ঞান-হীন পশু, এ দুয়ের আচরণ কোনো কোনো বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপে মিলে! যত দিন স্তনপানের আবশ্যক, যত দিন মাতৃ-যত্ন ব্যতীত জীবিত থাকা অসম্ভব, তত দিন পশু

পক্ষীর শাবকেরা মার কোল-যোড়া হইয়া থাকে ; যেই মাত্র উড়িতে কিংচরিতে শিখে ; অমনি তাহারা মা বাপের স্নেহ মমতা ভুলিয়া যায়, মা বাপও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ! অত্যন্ত সভ্য জাতির মধ্যেও এই প্রথার প্রাবল্য দেখা যায় ! সুতরাং রাজা আর ফকির, বুড়ো আর ছেলে বলিয়া যে প্রাচীন বাক্য আছে, তাহার সঙ্গে "সভ্যতম জাতি আর ইতর প্রাণী" এই নব্য শ্লোকও গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে !

অতএব সর্ব্বশুভপ্রেরয়িতা পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে একটু অল্প সভ্য রাখেন সেও ভাল, তবু যেন পিতা পুত্রে, মাতা পুত্রে, ভাই ভাইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রবৃত্তি হিন্দু-মনে সঞ্চারিত করিয়া না দেন !

কেহ কেহ সংশ্লিষ্ট পরিবার প্রথায় দুইটী বিশেষ দোষ দেখাইয়া থাকেন। এক,ইহাতে আলস্য বৰ্দ্ধন করে। অর্থাৎ এক জনের স্কন্ধে দশ জনে ভর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ; স্বতন্ত্র থাকিলে স্বীয় স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের পথ দেখিতে হইত, সুতরাং অলস থাকিতে পারিত না। দ্বিতীয় দোষ, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ। এই দুটীকেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু অপকার ও উপকার তৌল করিলে অপকার ভাগ নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব উপকার কয়টীর নামও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

১ম। সামাজিক বল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তৃণ একত্রিত হইয়া হস্তী বন্ধনেরও রজ্জু হয় !

২য়। স্বভাবানুযায়ী-কর্ত্তব্য-সাধন। পিতা পিতামহ,মাতা পিতামহী, ভ্রাতা ভগিনী, খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের পরম আত্মীয় যাঁহারা, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতিপালন ও স্নেহ-কারুণ্যে বদ্ধ থাকা, সম্পদ বিপদে সহায় হওয়া ইত্যাদি ব্যবহার যে স্বাভাবিক ও সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত কাজ, তাহাতে

সন্দেহ কি? যদি বলেন, স্বতন্ত্র স্থলে থাকিলে কি সে সব হয় না? কখনই এরূপ হইতে পারেনা। কথাতেই বলে "ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী!"

৩য়। দৃষ্টি ও শ্রুতি-সুখ। এ যেমন দেখিতে শুনিতে একটী আশ্চর্য্য সুষমার বিষয়, তেমন কি পার্থক্যে সম্ভবে? "সকলে মিলে জুলে স্বচ্ছন্দে আছে" এ প্রশংসা অবশ্যই প্রার্থনীয়।

৪র্থ। উপচিকীর্ষা, ভক্তি, স্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি প্রচুররূপে চরিতার্থ হইয়া পরম সুখের কারণ হয়।

৫ম। সর্ব্বোপরি স্ত্রী লোকের কুপ্রবৃত্তি নিবারণের এমন মহৌষধ আর নাই। তন্মাহাত্ম্য ইতিপূর্ব্বে বাহুল্য বলা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখের প্রয়োজনাভাব। অন্য অনুকূল হেতু না থাকিলেও সুদ্ধ এই এক কারণেই সংশ্লিষ্ট-অবস্থান-প্রথার জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিবার মধ্যে পরস্পরের আচরণ ও অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার।

সংশ্লিষ্ট পরিবার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে এ অঙ্গেরও কিয়দংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুরুলোকের প্রতি নিকৃষ্টের ভক্তি প্রকাশ ও বশ্যতা স্বীকার এবং নিকৃষ্টের প্রতি গুরু জনের অকৃত্রিম স্নেহ ও হিতকর শাসন হিন্দু পরিবারে অনুপম।

আবার হিন্দু প্রভু ভৃত্যকে যে ইউরোপীয় আধুনিক সভ্য জাতির ন্যায় চুক্তিমূলক বেতন-ভুক্ একটা ভাড়া করা সামগ্রী ভাবেন না, তাহাদিগকে পরিবারের সামিলই জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহা কে না জানেন? বালকপুত্রকে পিতা তাড়না করিলে যেমন কাঁদিতে

কাঁদিতে মার কাছে যায়, হিন্দু সংসারে ভৃত্যও ঠিক তদ্রূপে কর্ত্তা রাগ করিলে কি দৈহিক দণ্ডাদি প্রদান করিলে মুখের উপরি জবাবও দেয় না, আদালতে যাইয়া নালিসও করে না, সে কেবল গিন্নির কাছে গিয়াই আর্দ্দাস করে! গিন্নি শুনিয়া কর্ত্তার উপর বকিতে বকিতে তাহাকে কিছু আহার দিয়া তখন শান্ত করেন, কর্ত্তা বাটীর মধ্যে আইলে সকল ফেলিয়া আগে ব'দের কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না! হয়তো ব'দের চেয়েও আর একজন পুরাতন চাকর ব'দেকে তখনই এই বলিয়া বুঝায় "চাকর আর ছেলে তফাৎ কি? মনিব আর বাপে ভেদ কি? তিনি শাসন ক'র্ব্বেন না তো কে ক'র্ব্বে? একবার বা মারেন, একবার বা কোলে টানেন!" হায় একি সামান্য সুখের সম্বন্ধ!" ভৃত্যেরা ঐ স্নেহের পরিবর্ত্তে আবার প্রভুর প্রতি এত ভক্তি-পরায়ণ ও কৃতজ্ঞ থাকে, যে, তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে! সকল স্থলেই এরূপ অবিকল, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশই অভিন্ন এইপ্রকার। যাঁহারা পল্লীগ্রামে পুরাতন প্রভু ও ভৃত্যের আচরণ দর্শন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকেই সাক্ষী মানিতেছি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রভু পীড়িত হইয়া দীর্ঘ কাল শয্যা-শায়ী, সংসার চলেনা, চিকিৎসাদির জন্য সমস্ত জিনিস পত্র পর্য্যন্ত বন্ধক দেওয়া, ঋণের সীমা নাই। ভৃত্য জাতিতে ডোম, বাল্যাবধি ঐ প্রভুর নুন খাইয়াছে, প্রভুর এই অবস্থায় আপন স্ত্রী পুত্রকে দিবারাত্রি দ্বিগুণ খাটাইয়া, ঝুড়ি চুপড়ী বুনাইয়া, ধান ভানাইয়া এবং আপনি বিশ্রাম ত্যাগপূর্ব্বক নানা কাজ করিয়া, আপন সংসার ও প্রভুর স্বল্প সংখ্যক পরিবারের নির্ব্বাহ করিত। প্রভুর ঘর দুখানি মেরামত ভিন্ন চলেনা, বংশে কোথা হইতে বংশ আনিল, খড় আনিল, পাট কাটিল, আপনি সমুদয় করিল। কাষ্ঠ নাই, কোথা হইতে কাষ্ঠ আনিল, কিছুই বুঝা যায় না। এই ভৃত্যের এই ব্যবহার সে পল্লীতে উপন্যাস হইয়া আছে! দেশের এ সুখের অবস্থা বিলাতী

সভ্যতা যদি নষ্ট করে, তার চেয়ে আমরা একটু কম্ সভ্য থাকি সে কি ভাল নয়'?

*হিন্দু পরিবারে এরূপ আচরণের কথা সকলেই জানেন, সুতরাং এ পরিচ্ছেদে এ অংশটী লিখিবার আবশ্যক ছিল না। স্বদ্ধ এক কারণেই এ প্রসঙ্গ প্রবন্ধের প্রত্যঙ্গ করিতে বাধিত হইতেছি। সমাজ মধ্যে যাহার ঐশ্বর্য্য হয় আর সে যদি পাঁচটা সৎক্রিয়া করে, তবে তাহার কোনো কোনো দোষ থাকিলেও তাহা গণ্য হয় না, বরং তাহা আর পাঁচটা গুণের সঙ্গে বারুইয়ের গোচ-মধ্যস্থ পচা পানের ন্যায় বোঁটা গুন্তিতে চলিয়া যায়!

সেই রূপে ধরামণ্ডলে যখন যে জাতির জয়-ভাগ্য ও লক্ষ্মী-ভাগ্য প্রবল এবং সেই জাতির মধ্যে যদি নানা প্রকার সুনিয়ম ও সুপ্রথা দৃষ্ট হয়, তবে সে জাতির আভ্যন্তরিক দোষ গুলিও সেই সব গুণের সঙ্গে গুণ বলিয়া চলিয়া যায়। এবং যখন যে জাতির ভাগ্য-লক্ষ্মী দুর্ব্বাসার অভিশাপে ক্ষীরোদ সাগরে নিমগ্না থাকে, তখন সে জাতির সাহস, বীর্য্য, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীও মা লক্ষ্মীর অনুযাত্রী হয়। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক গুণ যে অতঃপরও সমাজ মধ্যে ও অন্তঃপুর মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া যায়, তত্তাবতকে কেহই আর বড় লক্ষ্য করে না, তাহারা বরং দোষের দলেই গণনীয় হওয়াতে অভিমানে ম্রিয়মাণ থাকে!

অনুধাবন করিলে ভারতের জেতৃজাতি ও বিজিত জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে এই উপমা সম্পূর্ণ সংলগ্ন হইতে পারে। আমাদের জেতৃ জাতির বাহুবল, বিদ্যাবল, সভ্যতাবল, বাণিজ্যবল, ঐশ্বর্য্যবল, আমাদের অপেক্ষা বহু সহস্রগুণে এত অধিক, সুতরাং বড় বড় বিষয়ে আমরা এত দুর্ব্বল, যে, তাঁহাদের যে সকল বল নাই, তাহার বড়াই শুনিয়াও আমাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়; এবং আমাদের সে সকল বল থাকিলেও আমরা বড়াই করিতে মুখ পাতিতে

পাই না! বিশেষতঃ আমাদের নব্য বাঙ্গালী বাবুরা না জানিয়া না শুনিয়া সাহেবদিগের মতের পোষকতা করেন এবং সামাজিক কল্পিত হীনতার জন্য রোদন করেন, সাহেবেরাও যো পান! অথচ তত্তদ্বিষয়ে আমাদের হীনতা দূরে থাকুক বরং আংশিক শ্রেষ্ঠতাই আছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ গুটিকতক বিষয় অদ্যই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বক্ষ্যমান আরো দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। আমাদের জেতৃ জাতীয় অনেকে জোর করিয়া বলেন, যে, হিন্দু গৃহিণীতে আর অন্য জাতীয়া দাসীতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। প্রবন্ধটী যদি বিস্তারিত হইয়া না পড়িত, তবে আমি বাহুল্যরূপ প্রতিবাদ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অসত্যতা দেখাইয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতাম। তথাপি কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারি না।—

এখন যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, এত দিনের পর স্ত্রীলোকের গৌরব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা দেশে দেখানো হইতেছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যখন সৃষ্টি হয় নাই—ইংরাজ জাতি যখন জন্মে নাই—ইংরাজের গুরু রোমক বংশও যখন আবির্ভূত হয় নাই, তখন অবধি হিন্দুমহিলার কত আদর, কত গৌরব, কত মান তাহা শ্রবণ করুন।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু ৩য় অঃ। ৫৬

যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।

সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

যে কুলে স্বামী পত্নীর প্রতি, পত্নী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

ঐ। ৫৮

ভগ্নী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপূজিত হইয়া যে কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন পশ্বাদির সহিত অভিচার হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ বহু বহু স্থলে শাস্ত্রে পুরন্ধ্রী মহিলাবর্গের সম্মান ও সন্তোষ বর্দ্ধনের বিবিধ প্রকার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে এবং আবহমানের ব্যবহারেও তাহা সম্যগ্রূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পুরস্ত্রীগণ গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করেন বলিয়া কি দাসী হইলেন? সেই সব গৃহকর্ম্ম কি তাঁহারা অনিচ্ছাতে, পুরুষের ভয়ে বাধিতা হইয়া পরের কাজ ভাবিয়া করেন? না স্বেচ্ছাতে; সন্তোষে, সুখের কাজ ভাবিয়া করিয়া থাকেন? সেই কাজ করাতে গৃহমধ্যে তাঁহাদের গৃহিণীত্ব ও একাধিপত্যের অধিকারটী কি অণুমাত্র হীনাঙ্গ হয়? না, সাংসারিক তাবদ্ব্যাপার স্বচক্ষে দৃষ্ট ও স্বহস্তে কৃত হয় বলিয়া সর্ব্ববিষয়ক ক্ষমতার আরো আধিক্যই হইয়া থাকে? তাহাতে কি সংসারের সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সমধিক সাধিত হয় না? তাহাতে কি স্বামী পুত্র ভ্রাতা ভৃত্য যাহার যাহা পাইবার, যাহার যাহা খাইবার, তাহা যথোচিতরূপে প্রাপ্তি হওয়াতে সকলেরই সন্তোষ হয় না? তাহাতে কি তাঁহাদের শরীর ও মনের জড়তা নষ্ট ও স্বাস্থ্য লাভ হয় না? তাহাতে কি শরীর ও মনোবৃত্তির কীটস্বরূপ ও সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির প্রবর্ত্তকস্বরূপ যে আলস্য, সেই আলস্য রোগের প্রতীকার হয় না? তাহাতে কি কুসঙ্গ ও কুবিষয়ের আলোচনার সময়াভাব হইয়া মহোপকার জন্মে না? প্রসবকালে দেখিবেন, তখনকার শ্রমশালিনী রম-

ণীরা বা কত সহজে এবং এখনকার নিষ্কর্ম্মা কার্পেট্-বুননীরা বা কত কষ্টে প্রসব হন ?

আবার তাহাও বলি ;—বিলাতে মধ্যবিধ ও সামান্য গৃহস্থ-ঘরের গৃহিণীরা কি স্বহস্তে এইরূপে গৃহকর্ম্ম করেননা? আর অধিক বলিবার সম্ভাবনা থাকিলে, বিলাতের গৃহচিত্র বিলাতের গ্রন্থ হইতেই দেখাইতাম। সেখানকার ধনী ভিন্ন কাহার কয়টা চাকর চাকরাণী আছে ? এদেশে যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, তাঁহারাও কি দাসদাসী রাখিতেছেন না ? কিন্তু সেরূপ যোত্রাপন্ন ব্যক্তি দেশের লোক-সমষ্টির কত ভাগের কত ভাগ, তাহাওতো ভাবিতে হয় ? অল্পাংশই তদ্রূপ সঙ্গতিবান, অধিকাংশই অপারক। সেই অসমর্থ শ্রেণীর উপায় কি ঠাওরাইলেন ? আপনাদের লম্বা লম্বা উপদেশ দ্বারা লাভে হইতে সে সকল লোকের মাথা খাইয়া দেওয়া হইতেছে ! পুরুষ পক্ষে এইরূপ উপদেশে একটী মহা কষ্টের সোপান তো পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে যখন দরিদ্র বালকেরা পড়ে, তখন উপদেশ পায় "সভ্য হও, সভ্য হও ! পাদুকা পায় দেও, গায় পিরান পর, চায়নাকোট পর, ইত্যাদি বহু !" তাহারা বাবু হইতে চেষ্টা করে, তাহাতেই অ-ভ্যস্ত হয়। প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে পড়ে। পিতা ভাবিতে-ছেন, ছেলে মানুষ হইল, আর চিন্তা কি ? কিন্তু হায় ! গ্রাম্য বিদ্যা-লয় ছাড়িয়া কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে যে পড়িবে, তাহার সে যোত্র নাই। ঐ পর্য্যন্তই শেষ হইল। পরে কর্ম্মের জন্য লালায়িত। দিব্য বাঙ্গালা জানে, কিঞ্চিৎ ইংরাজী ও সংস্কৃতও জানে, তথাপি যদি ৬। ৭ টাকা মাসিক বেতনের একটী চাকরী পায়, তবে যেন তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া যায় ! প্রথম হইতে সভ্য ও বাবু হইতে শিখিয়াছে, এখন আর পৈতৃক চাষ বাস, ক্ষৌর কর্ম্ম, সন্দেশ গড়া, তৈল ঘৃতাদি বিক্রয়, অথবা ব্রাহ্মণ হয় তো, যজনযাজন ভিক্ষা শিক্ষা প্রভৃতি কিছুই পারে না ! এদিগে চাকরীও যুটে না—সর্ব্বনাশ—এক-

বারে সর্ব্বনাশ'! যত দিন গ্রন্থবিদ্যা ও পৈতৃক কাজ কি কোনোরূপ ব্যবসায় দুই শিক্ষা একত্র হইবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন এই সর্ব্বনাশই থাকিয়া যাইবে—দিন দিন ইহা বাড়িতেই থাকিবে।

এক্ষণে আবার লোকের অন্তঃপুরেও সেই সর্ব্বনাশ বাঁধাইবার চেষ্টা হইতেছে! চারিদিগে রব, "সভ্যা হও, ভব্যা হও, গোবরে হাত দিও না, নোংরা গোলাহাঁড়া ছুঁয়োনা, খ্যাংরা হাতে ক'রোনা, আগুন তাতে যেয়োনা! দাসীর কাজ ঠাকুরাণী হয়ে তোমার কি করা উচিত? যদি সারা দিন পা'ট্ নিয়ে থাক্বে, তবে মানসিক বৃত্তির কখন্ কর্ষণ ক'র্ব্বে? কখন্ তবে অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্পেটের কাটি নিয়ে ব'স্বে?—সে না ক'ল্লে তে বিবীদের সভ্যতা পেতে পার্ব্বে না! অতএব খ্যাংরা, কুলো, হাঁড়ী, চুলো, ঢেঁকী, জাঁতা, ছাঁচকাটা, এ সব দূরে ফেল; বই ন্যাও, পশম ন্যাও, পোষাক পর, সমাজে যাও, বড় বড় সাধুভাষার কথা কও, আর দিবা রাত্রি কেবল শান্তি, স্বাস্থ্য, শারীরিক নিয়ম, মানসিক নিয়ম, মিতাচার, মিতব্যয়িতার আন্দোলন ক'রে জ্যেঠাই হয়ে ব'সে থাকো!!

যাহারা বাহ্য-রূপে মুগ্ধ, তাহারা সংসারমধ্যে এই নবপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা দেখিয়া হর্ষ সাগরে সন্তরণ দিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহাদিগের একটু তলিয়ে দেখা অভ্যাস, তাঁহাদের ভাগ্যে তদ্দর্শনে তত তৃপ্তিসুখ ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা দেখেন, এ প্রণালীতে মুখে যত, কাজে তত মিতাচার ও মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য ও শান্তির সঞ্চার নাই! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা "স্বাস্থ্য" শব্দটী জানিতেন না, মুখেও আনিতেন না, অথচ যথার্থ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন—এখনকার স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ-লেখক ও বক্তৃতাকারকের অপেক্ষা চতুর্গুণ, ষষ্ঠগুণ, কখনো বা অষ্টগুণ আহার্য্য উদরস্থ ও অনায়াসে জীর্ণ করিয়া যথার্থই সুস্থ ছিলেন; আজ্ কা'ল্ আমাদের যুবক যুবতী ও বালক বালিকা প-

র্য্যন্ত "স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য" করিয়া যত পাগল, ততই হীনবল হইতেছে —ক্ষুদ্র মৎস্য ও লঘু মুগের সূপও পরিপাক করিতে অক্ষম!! মিতাচারের কথা কি বলিব? যে মদ্যপানে সদ্য জাতি-চ্যুত হইতে হইত, সেই গরলের স্রোত অনর্গল অবিরলরূপে সমাজের অন্দর বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে!

মিতব্যয়িতাও সেইরূপ; যৎকালে অন্তঃপুরে তাহার প্রসঙ্গ লইয়া প্রিয়সঙ্গিনীগণমধ্যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, হয় তো তৎকালে বহির্ব্বাটীতে মুন্সেফের পেয়াদা আসিয়া স্বামীর হাতে শমন খানি দিয়া গেল! দাস দাসী সূপকারিণী রাখিবার সঙ্গতি নাই, তবু রাখিতে হইয়াছে! উত্তম পশম, উত্তম উত্তম সংবাদ পত্র, উত্তম উত্তম পুস্তক, এসব সংগ্রহের পয়সা নাই, তবু যেমন করিয়া হউক যোগাইতেই হইয়াছে! সে টাকা কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই তণ্ডুল, দ্বিদল, তৈল, লবণ ও পরিধেয় থানকাপড়, পূর্ব্বে যাহা নগদ টাকায় আসিত, এখন তাহার ঋণ হইয়া সেই টাকায় ঐ সভ্যতার আয়োজন হইয়াছে! দোকানীর অপরাধ কি? বৎসরাধিক হাঁটিয়া হাঁটিয়া না পাইয়া শেষে শমন করিল!

হায়! এ সব তত্ত্ব কেউ রাখে না! কেবল বলে, এদেশের স্ত্রী জাতি বড় দুর্ভগা, বড় দুখিনী, বড় তাপিনী, পরাধিনী, চাকরাণী! হা! কি বিষম ভ্রান্তি! তাহারা যদি চাকরাণী, তবে ঠাকুরাণী কে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে সংশ্লিষ্ট-পরিবার-প্রথার এত যে বাঁধনী, যাহা ঋষিবাক্য হইতে আরম্ভ হইয়া পুরুষানুক্রমিক ব্যবহার ও সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞ কর্ত্তৃক নিয়ত আদিষ্ট হইতেছে, সেই বন্ধনীকে শিথিল করিয়া দেয় কে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে যে সব বাটীতে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ বন্ধ, সে সব বাটীতে ছাপ্পান্ন কোটী ব্রতোপলক্ষে পুরোহিত ঠাকুর দিব্য হৃষ্ট পুষ্ট হন কিসে? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে যে সব সংসারে পুরুষের

অনুষ্ঠেয় পৈতৃক ক্রিয়া কাণ্ড রহিত হইয়াছে, সে সব সংসারে দ্বিতীয় উৎসব উপলক্ষে দুই তিনটী দুর্গোৎসবের ব্যয় হয় কিসে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে দেশের অন্য কারুকর অপেক্ষা স্বর্ণকার বড় মানুষ হয় কিসে ? তাহাদের যদি ক্ষমতা নাই, তবে কায়স্থদের বল্লালী কৌলিন্য উঠিয়া গিয়া "ইউনিভার্সিটী-কৌলিন্য" চলিত করিল কে ?

তাহাদের আবার ক্ষমতা নাই, যাহাদের জন্য পুরুষের সংসার ধর্ম্ম সকলি—যাহাদের জন্য শোভাময়ী পুরী—যাহাদের জন্য লক্ষ লক্ষ কি কোটী কোটী মুদ্রার হীরা মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত রাশি রাশি সভ্যা ধরণীতে প্রতি দিন ক্রয় বিক্রয় হইতেছে—যাহাদের সুচারু সজ্জার জন্য ঢাকা, শান্তিপুর, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি শত শত স্থানের অসংখ্য বেশকারীরা বারমাস নিযুক্ত রহিয়াছে—যাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য হিন্দু পুরুষমণ্ডলী মান, প্রাণ, ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া—ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরের ভাণ্ডার লুঠিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতেছে !

তাহাদের মানের কি ইয়ত্তা আছে, যাহাদের গৌরবার্থ শাস্ত্র-কারেরা—বনমূল-ফলাশী কঠোর-ব্রত নীরস কর্কশ ঋষিরাও এমন সরস নাম উৎপাদন করিয়াছেন—জায়া, ভার্য্যা, গৃহলক্ষ্মী, অঙ্কলক্ষ্মী, গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিণী ! এই সব নামেতেই পঞ্চ বর্ষীয় বালকও বুঝিতে পারে, যে, হিন্দু মহিলা দাসী নয় ; হিন্দু মহিলা গৃহকার্য্য-কুশলা হইলেও পরিচারিকা নয়, হিন্দুমহিলা স্বামী-সেবিকা বলিয়া হিন্দু পুরীর সৈরিন্ধ্রী নয়, হিন্দুমহিলা অতি উচ্চ মানের—অতিশয় আদরের—অতি গৌরবের—অতি যত্নের সামগ্রী !

তাহাদের ক্ষমতা আর মানের কি সীমা আছে, যাহাদের পরিতোষার্থই এবং যাহাদের প্রিয় পাত্রের সম্মানার্থই শাস্ত্রকারেরা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া নাম্নী ভ্রাতৃ-পূজা, আরণ্য-ষষ্ঠী নাম্নী জামাতৃ-পূজা, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী নাম্নী স্বামী-পূজার সৎপ্রথা সমূহের সন্বিধান করিয়া দিয়া-

ছেন ! ফল কথা, গৃহস্থাশ্রমে যাহাদের জন্যই সব ! যাহাদিগকে শাস্ত্র ও ব্যবহার স্ত্রীও বলে, শ্রীও বলে—

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।”

অতএব হিন্দুস্ত্রীকে দাসী ও পরাধিনী বলিয়া তাহাদের জন্য অঝ্‌ঝোর নয়নে রোদন করার তাৎপর্য্য যে কি তাহা বুঝিয়া উঠা ভার !

“পরাধিনী” তাহারা অবশ্য। সে তো অন্যভাবে অধিনী নয়—কৌমারকালে প্রতিপালক রক্ষক জন্মদাতা জনকের স্নেহের অধিনী—যৌবনে প্রেমময় পতির প্রেমাধিনী—বার্দ্ধক্যে যদি দুর্ভাগ্যে পতি-হীনা হয়, তবে ভক্তিমান পুত্রের শ্রদ্ধাধিনী—যদি নিতান্ত দুরদৃষ্ট বশতঃ পতি-পুত্র-হীনা হয়, তবু দেবর ভাশুরাদি জ্ঞাতি বা সহোদরাদির কর্ত্তব্যাধিনী !

বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥

মনু। ৫ ম অ। ১৪৮।

স্ত্রীলোক বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, স্বামী মরিলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বামীর সপিণ্ড অভাবে পিতৃ সপিণ্ড, তদভাবে রাজার বশে থাকিবে। স্ত্রীলোক কখনো স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে না।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাংহি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভেকুলে॥

পিতা, স্বামী, পুত্র, ইহাদের হইতে স্ত্রী কদাপি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না ; যেহেতু এরূপ বিয়োগে পিতৃভর্ত্তৃ উভয় কুলই নিন্দিত হয়।

অতএব স্ত্রী লোকের স্বাতন্ত্র্য, কি শাস্ত্র কি যুক্তি, কিছুরই গ্রাহ্য নহে। হিন্দু-স্ত্রীর যে অধীনতা, তাহার প্রকৃত ভাব ইউরোপীয়েরা

এবং সুদ্ধ ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত নবযুবকেরা বুঝিতে পারেন না। এমন অধীনী হওয়া তো গৌরবের বিষয়—এমন অধীনতার জন্যই হিন্দু-কুলে সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে—শত শত বর্ষের রাজকীয় অধীনতা সত্ত্বেও অদ্যাপি পরম পবিত্র সতীত্ব নিধি শারদীয় পূর্ণ শশীর ন্যায় সুনির্ম্মল, সুশীতল, অতি শুভ্র সমুজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করিতেছে!

এস্থলে সেই পরাধীনতা-রূপ কল্পিত কলঙ্ক-ধারিণী ও আরোপিত শৃঙ্খল-বাহিনী হিন্দু-গৃহিণীদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচরণ কি রূপ এবং কি ভাবে তাহারা সেই অধীনতাকে অঙ্গের অমূল্য অলঙ্কার অপেক্ষাও সাদরে বহন করিয়া থাকে, তাহা অতি সংক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণেও বিবৃত হওয়া উচিত। হিন্দু-ধর্ম্ম-নীতি হইতে নিম্নোদ্ধৃত শাণ্ডিলী-বিবরণে পূর্ব্ব কালের গৃহদেবী-রূপিণী গৃহিণীর ব্যবহার প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

"পতিব্রতা শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করিলে দেবলোক-বাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি কি পুণ্য বলে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? শাণ্ডিলী উত্তর করিলেন—

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা।
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবং।
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্ত্তিনী।
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈতন্মনোগতং।
অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ।
অসদ্বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা।
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।

আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা।
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং
কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু।
প্রাতরুত্থায় তৎ সর্ব্বং কারয়ামি করোমি চ।
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা।
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি।
নোত্থাপয়ামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
আতুরেম্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মে মনঃ।
নায়াসয়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেঽপি সর্ব্বদা।
গুপ্তগুহ্যা সদা চাস্মি সুসংসৃষ্ট নিবেশনা।
এবং ধর্ম্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে।

দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটা ধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখনো ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই; সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণ গণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোনো ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোনো হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহারে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি

কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না ; পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজন-দিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎ-সমুদায় সম্পাদন করিতাম ; আমার পতি কোনো কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ-সংস্কার এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম ; যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না ; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়াস দিতাম না ; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদায় পরিষ্কার রাখিতাম। যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন।”

ইউরোপীয়েরা পুরাকালকে লৌহ-যুগ এবং বর্ত্তমান কালকে স্বর্ণ-যুগ কহিয়া থাকেন। হিন্দুরা পূর্ব্বকালকে সত্যযুগ এবং আধু-নিক কালকে কলিযুগ বলেন। উভয় জাতির পক্ষেই ঐ মীমাংসা স্বাভাবিক। কেননা, ঐশ্বর্য্য, সভ্যতা, ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ইউরোপ এখন যে পরিমাণে উন্নত, ভারতবর্ষ জ্ঞান ও ধর্ম্মমূলক সভ্য-তায় সেই পরিমাণে অবনত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাণ্ডিলীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া হিন্দু-পতিব্রতার অনুপম সুখের সংসারের প্রতি যাহার না ভক্তি জন্মে, তাহার হৃদয় কেবল বগী গাড়ী, সাহেব বিবী, গড়ের মাঠ, এক ঘোড়ায় সাহেব আর ঘোড়ায় ম্যাম, বিবীর বিম্বাধরে হাস্য, উভয়ের প্রেমালাপে ভ্রমণ, ইত্যাদি রমণীয় দৃশ্য সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহার অন্যথা নাই! হিন্দু-পরিবারে বাহ্য-দৃশ্যের পরিবর্ত্তে ফল্গুনদী-প্রবাহের ন্যায় গুপ্ত প্রেম ও গুপ্ত সুখ যে বহিতে থাকে, মূঢ়জন-চিত্ত কি তাহা অনুধাবন করিতে

পারে ? শাণ্ডিলী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী, দময়ন্তী প্রভৃতি পরমা সাধ্বী সতীদের যুগ গিয়াছে, এখন কলি কাল, তথাপি, অদ্যাপি হিন্দু-পরিবারে স্ত্রীজাতির কত অসংখ্য প্রকার ত্যাগ-স্বীকার ও অটুট ধর্ম্ম-বুদ্ধি যে বলবৎ আছে, তাহার সীমা করা যায় না। শাণ্ডিলীর গুণাবলীর সকলই যে এখন অভাব হইয়াছে, তাহা কদাচ নহে। বোধ করি, আজ্ কা'ল্ কলিকাতার কতিসংখ্যক পরিবার ব্যতীত সমস্ত বঙ্গীয় সংসারের স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃকালাবধি রজনীতে শয়ন-সময় পর্য্যন্ত যে রূপ আচরণ করেন, তাহা কাহারো অগোচর নাই। স্বহস্তে পাক, সকলকে আহার করাইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই ভোজন, প্রাণান্তেও উত্তম সামগ্রী প্রিয় জনকে না দিয়া গ্রহণ না করা, অনেকের আবার এককালেই সে সুখে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিতা হওয়া, অনাটনের সংসারে বহু প্রকার সুবুদ্ধিযোগে ও সুকৌশল সহকারে পরিপাটী গৃহস্থালি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করা, যথাজ্ঞান নানাবিধ মাঙ্গলিক লক্ষণ পালন করা এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে, বাহ্যিক নয়, ঐকান্তিক—সমাজ বা গির্জ্জা-গমনের আড়ম্বর নয়, গৃহমধ্যেই যথা-সাধ্য পরম শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, ইত্যাদি কথা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং বাহুল্যরূপে চিত্রিত করা অনাবশ্যক।

আমরা জানি অধিকাংশ স্ত্রীলোক মূর্খতা নিবন্ধন দ্বেষ, হিংসা, কলহ-প্রিয়া; আমরা জানি, তাহারা সেই মূর্খতা কারণেই বস্তুজ্ঞানে ও কর্ত্তব্যাবধারণে অত্যন্ত হীনা, আমরা জানি, তাহারা লঘুচেতা ও ক্ষুদ্রাশয়া; কিন্তু তদ্রূপ ক্ষুদ্র দোষ যতই থাকুক; তাহাদের বাহ্য-সভ্যতার যতই অভাব হউক; বুদ্ধিবৃত্তি যতই অমার্জ্জিত থাকুক, মূল বস্তুতো আছে—নারীর প্রধান অলঙ্কার হৃদয়ের ঔৎকর্ষ আর পাতি-ব্রত্য ধর্ম্মতো আছে! যত কিছু সামান্য দোষ আমাদের স্ত্রীসমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তজ্জন্য এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? এক্ষণে সুশিক্ষার সদুপায় হইয়াছে, তৎপ্রভাবেই অল্পকাল মধ্যেই সে সব

অম্বুহিত হইতে পারিবে ! কিন্তু ভয় হয়, যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধি-বৃত্তির অতিশয় প্রাখর্য হইয়া পাছে আমাদের সদ্ভাব-রূপিণী রমণীকুলের সাদরের সকাব সদ্ভাব-মাধুর্য্যের অসদ্ভাব ঘটিয়া উঠে ! মনের কথা খুলিয়া বলিলেই পাগল হয় ! আমাদের ঐ সব কথা শুনিয়া অনেক উগ্র সভ্য আমাদিগকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপ স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কি অবলাগণকে নিতান্ত প্রবলা ও স্বেচ্ছাচারিণী করিয়া দেওয়া হইতেছে না ? এবং পূর্ব্বকার প্রার্থনীয় অধীনতার যে প্রকার দোষোদ্ঘোষণ করা হইতেছে, তাহাতে কি আত্মীয় জনের অধীনতা ও দেশাচারের অধীনতার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বাহ্য সভ্যতা ও অতি-আচারের দাসী করিয়া দেওয়া হইতেছে না? স্নেহবান আপনার জনের বশ্যতা স্বীকার স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সে বশ্যতাকে অধীনতা ও দাস্য-বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করা হয় স্থূল বুদ্ধি, নয় বিকৃত বুদ্ধির কাজ, সন্দেহ নাই !

অধীনতা ও স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা অগ্রে ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রাণ অথবা মাননাশের শঙ্কাতে অনিচ্ছাতে কাহারো আজ্ঞাবহন করাকেই অধীনতা বলা যায়। ইচ্ছাপূর্ব্বক মঙ্গলার্থী-জনের বশীভূত হওয়াকে অধীনতা বলা উচিত নহে। এবং কল্যাণ উদ্দেশে যে সব নিয়ম করা হয়, সে সকল নিয়মের শাসনে থাকাকেও অধীনতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। অপিচ কাহারো বশীভূ থাকিব না, কোনো নিয়ম গণ্ডীর সীমা মান্য করিব না, আমি স্বা কাহারো শাসন গ্রাহ্য করিব না, এরূপ ঔদ্ধত্যতাই কি স্ব গুরু লঘু সম্পর্কটী স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যই পুরুষের অধীন রমণী, ইহাও স্বাভাবিক, সুতরাং পরমাত্মীয় পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের শ মঙ্গলগর্ভ নিয়ম সকল পালন করাতে

কিছুই অগৌরব নাই, বরং তাহাতে গৌরব, মান, ধর্ম্ম, যশঃ, তৃপ্তি, আ...দাভাব এবং ভয়শূন্যতা প্রভৃতি অশেষ শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে। তাঁহাদের তত্ত্বা...ধান ও শাসন-রজ্জু হইতে বিচ্ছিন্না হওয়া তো স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নয়, অধঃপাতে যাওয়া!! অতএব হিন্দু-ম...লার যে অধীনতা আছে, তাহা সর্ব্বাংশে কল্যাণাস্পদ কি না, ভাবিয়া দেখুন।

বোধ হয়, উন্নতি-পিপাসাতুর দেশীয় ভ্রাতাগণের চক্ষে এরূপ সুফলদায়ক অধীনতা কারাবরুদ্ধ লোকের অধীনতা-রূপে অনুভূত হয়। বিলাতে এরূপ অধীনতা তো নাই, সুতরাং তাঁহাদের তাহা অবশ্যই বিষব... অগ্রাহ্য হইবে! আমাদের দেশে পুরস্ত্রীগণ অন্তঃপুরে অবরোধিতা থাকেন বটে, কিন্তু সে যে ধর্ম্মের অনুরোধে; সে যে স্ত্রীজাতির অনুপম ভূষণ যে লজ্জা সেই লজ্জার অনুরোধে; সে যে সেই পরম শান্তির অনুরোধে, যে শান্তি মনুষ্যের গৃহ মধ্যেই প্রাপ্য, বাহিরে নয়; সে যে সেই সতীত্ব মাণিক্যের অনুরোধে, যে সতীত্ব রত্ন হিন্দুজাতির রাজ্য ধন কীর্ত্তি মান সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণীয় পরম নিধি; ভায়ারা তাহা বুঝেন না! তাঁহারা চান্ কুলকামিনীরা নিতান্ত স্বাধীনা হবে; যদৃচ্ছাচারিণী হবে; যদৃচ্ছাগামিনী হবে; হাটে যাবে, সভায় যাবে, উৎসবে যাবে, বায়ু সেবনে যাবে, যথা ইচ্ছা তথায় যাবে; বারণ করিবার কেহই থাকিবে না; দেখিবার কেহই থাকিবে ...া; শুনিবারও কেহ থাকিবে না; জিজ্ঞাসিবারও কেহ থাকিবে ...; যথা ইচ্ছা তথায় যাইবে; যাহার নিকটে ইচ্ছা তাহার নিকটে ...বে; যাহার সঙ্গে ইচ্ছা তাহার সঙ্গেই যাইবে! ভায়ারা ক... যে জীব, তাহার পতিও সেই জীব, পতি যদি স্বা... ইচ্ছা যাইতে পারে, সেই বা না পারিবে কেন?

কি ভ্রান্তি! পতি পত্নী—পুরুষ রমণী যে এব... ...লিল? আকারে ভিন্ন, প্রকারে ভিন্ন, স্বভ...

দের নির্ম্মাণে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও ভিন্ন! এক জন কর্কশ, অন্যে মধু-ময়ী! এক জন ব্যস্ত, অন্যে সুস্থা! এক জন গুরুতর কঠিন-কর্ম্মা, অন্যে লঘুকার্য্য-কুশলা! এক জন স. অহংকার, অন্য ব্যবস্থা-কারিণী অধিক কি, এক জন সন্তানের জনক, অন্যে জননী। এক জনের বিশাল বক্ষঃ নিতান্ত রসহীন, অন্যের কোমল হৃদয়খানি পয়ঃসুধা রি কাদম্বিনী! এক জন শ্রান্ত হইয়া আসিবে, অন্যে মধুর সম্ভাষে, মধুর সুহাসে, মধুর মৃদু সেবায়, মধুর আহার্য্য ব্যবহার্য্য প্রদানে সেই দূর করিবে—অস্থির প্রাণকে সুস্থির করিবে—শান্তিরূপিণীর ব্যবহারে শ্রান্তি শান্তি হইয়া অন্তস্তলে শান্তিরস সিঞ্চিত হইবে। এ জন্যই রামাভিষেক নাটকে শ্রীরামচন্দ্র জনক-নন্দিনাকে কহিলেন:—

কৃষক যখন কাতর শ্রমে;
নিদাঘ তপন মস্তকে ভ্রমে;
স্বেদজলে সিক্ত হয়ে ক্ষেত্র হ'তে আসে;
কে তারে শীতল করে, মধুর সম্ভাষে?

দানব-সমরে, অমর-পতি,
অস্ত্রানলে দগ্ধ, ব্যথিত অতি,
সুরপুরে প্রবেশিলে হয় প্রতীকার।
শচী-প্রেম-সুধা বিনা, কি ঔষধ তার?

ভাস্কর সদত প্রখর করে,
পয়োধি-জীবন শোষণ করে,
তরঙ্গিণী-অঙ্গ-সঙ্গ, যদি না পাইত
ভেবে দেখ, সাগরের কি দশা হইত?

রাজ্য-চিন্তানলে দহিব যবে,
সেরূপে বল কে যুড়াবে তবে ?
বনা ও বদন-বিধু-হাস্য-সুধাবৃষ্টি,
নীলোৎপল-দলতুল্য নয়নের দৃষ্টি ?

এমন হিন্দু-স্ত্রী আবার দাসী ! হা ঈশ্বর !! এরূপ বিজাতীয় গণের দাসগণের হস্তে আমাদিগকে রক্ষা কর !

সমাপ্ত ।